বেণীমাধব ও ফণীভূষণ

স্মারক বক্তৃতামালা

অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম

কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূলবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

বেণীমাধব ও ফণীভূষণ স্মারক বক্তৃতামালা

প্রথম বক্তৃতার বিষয়

বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতিচেতনার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বমনীষা
অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এবং বৌদ্ধ সমাজের অগ্রগতিতে
প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট ফণীভূষণ বড়ুয়ার অবদান

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

নতুন ও পরিবর্তিত জীবনের জন্য সংস্কৃতিচর্চা অপরিহার্য

প্রথম বক্তৃতা অনুষ্ঠান

০৬ ডিসেম্বর ২০০১

২২ অগ্রহায়ণ ১৪০৮

বৃহস্পতিবার

চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তন

অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ৪৪ কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম

কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

বিশ্বমনীষা ড. বেণীমাধব বড়ুয়া
জন্ম : ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ ৩১ ডিসেম্বর
মৃত্যু : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ ২৩ মার্চ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাচীন দর্শনক্ষেত্রে যে কয়েকজন মনীষী ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এশিয়াবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট ডিগ্রী প্রাপ্ত ভারততত্ত্ববিদ বেণীমাধব বড়ুয়া অগ্রগণ্য। সারা জীবনব্যাপী প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য-প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় আত্মনিবেদিত করে তিনি এ সত্য উদঘাটন করেছেন যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন পৃথক ধারায় বিকাশ লাভ করলেও তা উপমহাদেশের ধর্ম ও দর্শনের অবিচ্ছেদ্য মহামূল্যবান অংশরূপে বিশ্ব সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করেছে। অধ্যাপনা, গবেষণা ও গ্রন্থরচনায় নিবিষ্ট থেকেও আমৃত্যু বিভিন্ন সমাজ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র, সভা ও সম্মেলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সমাজ বিকাশেও অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।

ক্রান্তিকালীন বৌদ্ধনেতা
অ্যাডভোকেট ফণীভূষণ বড়ুয়া
জন্ম : ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ ১৫ জুলাই
মৃত্যু : ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ ২ জুলাই

আইনজীবী, সমাজকর্মী ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ফণীভূষণ বড়ুয়া পাকিস্তান গণপরিষদের নাগরিক অধিকার কমিটির সদস্য হিসেবে একটি কর্মবহুল জীবন অতিক্রম করেন। জীবনের অর্ধশতাব্দী ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয় কর্মধারায় তিনি ব্রিটিশ-ভারতে ও পাকিস্তানে পশ্চাৎপদ সংগ্রামশীল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিকাশে ও উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখেন।

আমাদের কথা

নতুন ও পরিবর্তিত জীবনের জন্য সংস্কৃতিচর্চা অপরিহার্য-এ প্রত্যয় থেকে সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন ও অতলস্পর্শী জীবনবোধন, মুক্ত মানসিকতা অর্জন ও হতাশা দূরীকরণ, যুগসংবর্ধনা ও সম্মুখপথে বিচরণ এবং শান্তির পক্ষাবলম্বনের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর যাত্রা শুরু। এ যাত্রাপথে যাঁদের শ্রমে-মেধায় গড়া ঋজু-ঋদ্ধপথে আমরা সমুখে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এগিয়ে যাবার অঙ্গীকার মেনে চলছি তাঁদের মধ্যে অকাল প্রয়াত দুই সহসংস্কৃতিকর্মী সংগঠনের মুখপত্র 'অনোমা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুসাহিত্যিক অরুণ বিকাশ বড়ুয়া এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব, লেখক সংগঠক জগত্‌জ্যোতি বড়ুয়াকে গভীর শ্রদ্ধা ও পরম মমতায় স্মরণ করছি।

দু'দশক ব্যাপী সময়ে অনোমা সর্বজনীন এবং অসাম্প্রদায়িক বোধ থেকে সকল প্রকার অন্ধ গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা, পশ্চাৎপদতা, কূপমন্ডূকতা, কুসংস্কার ও স্থবিরতার বিপরীতে একটা পিছিয়ে পড়া সমাজকে বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ও মুক্তবুদ্ধির চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-চেতনায় বিকশিত করার তাগিদে কাজ করে যাচ্ছে।

জন্মলগ্ন থেকে সংগঠন কর্তৃক গৃহীত বৌদ্ধ ইতিহাস-পারিবারিক আইন-সাহিত্য-দর্শন-মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, কবিয়াল ফণী বড়ুয়া, ভাষা সৈনিক মাহবুব উল আলম চৌধুরী, চট্টল তত্ত্ববিদ আবদুল হক চৌধুরী, গল্পকার সুচরিত চৌধুরী, কীর্তনীয়া পুলিন বিহারী সুশীল, রাজনীতিবিদ কমরেড শরদিন্দু দস্তিদার, শিক্ষাবিদ কবি ওহীদুল আলম, ক্রীড়া সংগঠক ডাঃ কামাল এ খান, সমাজসেবক সাব-রেজিস্ট্রার জ্যোতিষ চন্দ্র বড়ুয়া, কীর্তনীয়া ডাঃ ব্রজকিশোর বড়ুয়া, প্রবীণ সংস্কৃতিকর্মী প্রীতিভূষণ বড়ুয়া, কমরেড মিলন প্রভাস বড়ুয়া প্রমুখ গুণীব্যক্তিত্ব সংবর্ধনা, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীর বিপ্লবী এবং '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মরণে অনুষ্ঠান, বিভিন্ন মনীষীদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন, কবিতা পাঠের আসর, জাতীয় স্মরণীয় দিন উপলক্ষে আলোচনা সভা, নিয়মিত

সংগঠনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক মুখপত্র 'অনোমা', সংগঠনের প্রকল্প বাংলাদেশ বৌদ্ধ একাডেমীর মুখপত্র 'বুডিস্ট একাডেমী জার্নাল' এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে 'একুশের পদাতিক' প্রকাশনা ইত্যাদি কার্যক্রম সুধীমহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। তদুপরি দুর্গত মানুষের লেখক রাজনীতিবিদ অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমেদ, জাতির বিবেক সাহসিকা জননী কবি বেগম সুফিয়া কামাল, সূর্যসাথী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, নারী নেত্রী লেখিকা উমরতুল ফজল, সংগীতাচার্য জগদানন্দ বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সংঘরাজ পন্ডিত শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের, দেশের প্রধান ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, প্রথিতযশা প্রবীণ সাংবাদিক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ প্রতিভা মুৎসুদ্দীকে তাঁদের কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ 'বৌদ্ধ একাডেমী পুরস্কার' এবং লেখক-সংগঠক-সংস্কৃতিকর্মী জগত জ্যোতি বড়ুয়াকে 'কৃপাশরণ স্বর্ণপদক' প্রদান করতে পেরে আমরা ধন্য হয়েছি, লাভ করেছি তাঁদের দুর্লভ সান্নিধ্য এবং এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

সেই অনুপ্রেরণার আলোকে পূর্বোক্ত কাজের ধারাবাহিকতায় সংগঠনের উদ্যোগে সংগঠনের আজীবন সদস্য মুক্তিযোদ্ধা সমাজসেবক শিক্ষানুরাগী লায়ন গভর্ণর রূপম কিশোর বড়ুয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় এ বছর প্রবর্তিত হয়েছে 'বেণীমাধব ও ফণীভূষণ স্মারক বক্তৃতামালা।'

উল্লেখ্য, এশিয়াবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট ডিগ্রী প্রাপ্ত ভারততত্ত্ববিদ, দার্শনিক অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এবং সাবেক পাকিস্তান গণপরিষদের নাগরিক অধিকার কমিটির সদস্য, আইনজীবি, সমাজকর্মী ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ফণীভূষণ বড়ুয়া স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে আপন আপন মহিমায় ভাস্বর সমাজ গগনের দু'উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অথচ তাঁরা আজ বিস্মৃতির অতলে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন যে'টি নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত। সমাজসচেতন-যুগসচেতন ব্যক্তি বা সংগঠনের উচিত পূর্বসূরিদের কীর্তিগাথা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানো এবং পরিচর্যা করা উচিত পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া রিক্থ। নতুবা প্রজন্ম ক্রমে আত্মঐতিহ্য পরিচয়হীন হয়ে স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে অস্তিত্ব হারাবে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার আশংকা থেকে প্রজন্মকে মুক্তির দেয়ার সৎ অভিপ্রায়ে এ দেশের পশ্চাৎপদ ক্রমবিকাশমান বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণ জীবনবোধে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দু'কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব স্মরণে এ বক্তৃতামালার আয়োজন। প্রতিবছর দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিকে দেশ-বিদেশের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি ইত্যাকার বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্য আহবান জানানো হবে।

আমরা শুধু অতীতকে আঁকড়ে ধরে সুদূর পেছনে ফিরে যেতে আগ্রহী নই; অতীতের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে পূর্বসূরিদের গৌরবদীপ্র চেতনার সারাৎসার মননে-চিন্তনে ধারণ করে যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যেতে চাই, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চাই এক সুন্দর নিকোনো উঠোন যেখানে সকল প্রকার পঙ্কিলতা-স্থবিরতা ভেদ করে বেড়ে উঠবে এক জঙ্গম-প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেই প্রত্যাশায় বিস্মৃতিপ্রবণতার অপবাদ ঘুচিয়ে বেণীমাধব ও ফণীভূষণ স্মারক বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা অনুষ্ঠানে এ ক্ষণজন্মা দু'কীর্তিমানকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে দু'জনের জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে সুবিদিত সমাজের আরেক হিরণ্ময় সন্তানের লেখনীতে।

অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম।

বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতি চেতনার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বমনীষা অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এবং বৌদ্ধ সমাজের অগ্রগতিতে প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট ফণীভূষণ বড়ুয়ার অবদান

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নবজাগৃতির সূচনা ঘটে। ১৮৬৪ সাল থেকে সংঘরাজ সারমেধ সংস্কারান্দোলন বৌদ্ধদের তন্ত্রবাদ প্রভাবান্বিত ধর্ম থেকে থেরবাদের মৌলিক ধর্ম-বিনয়ে প্রত্যাবর্তনে উদ্দীপিত করে। ক্রমপরিণতিতে অনগ্রসর বৌদ্ধরা নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তসীমায় অবস্থানরত ছোট্ট বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রথম সমাজ সংগঠন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠাকে ঐতিহাসিক বলা চলে। প্রাতঃস্মরণীয় দু'জন সমাজ নেতা কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী বা কৃষ্ণ নাজির ও গুণমেজু মহাস্থবির এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। প্রায় একই সময়ে চট্টগ্রামের প্রাতঃস্মরণীয় ভিক্ষু কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির বাংলার তথা ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ধর্মাংকুর বিহার ও বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতে প্রায় অবলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণে শ্রীলঙ্কার কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব অনাগারিক ধর্মপালের সাথে সহযোগী ভূমিকা পালন করেন। এই মহাভিক্ষুর সস্নেহ প্রভাবে বাংলার ব্যাঘ্র নামে নন্দিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে পাহাড়তলী, সাতবাড়িয়া ও হাররাং গ্রামে তিনটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সূচিত হয়। ১৯০২ বা মতান্তরে ১৯০৫ সালে বৌদ্ধদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম উচ্চ ইংরেজী মহামুনি এংলো-পালি ইনস্টিটিউশনসহ পরবর্তীতে বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠিত আরো সাতটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল মহাত্মা কৃপাশরণের প্রভাবে স্যার আশুতোষের উদ্যোগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। বাঙালী বৌদ্ধরা ইংরেজীতে উচ্চ শিক্ষার পথে অগ্রসর হতে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় কয়েকজন বৌদ্ধ ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা ও আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৮ সালে বৌদ্ধদের মধ্যে মহামুনি পাহাড়তলীর মহিমারঞ্জন বড়ুয়া সর্বপ্রথম বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ সালে তিনি এবং আরো দু'জন বৌদ্ধ ছাত্র রেবতীরমন বড়ুয়া ও বেণীমাধব বড়ুয়া কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে এম.এ. পাশ

করে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। মহিমারঞ্জন বড়ুয়া পালিতে অধ্যাপক হন এবং পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দেশান্তরী হয়ে স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে বসবাস করেন। রেবতীরমন বড়ুয়া ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকুরী শেষে অবসর গ্রহণ করেন। অতি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত হয়ে অসামান্য প্রতিভাবলে বেণীমাধব বড়ুয়া লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ সালে প্রথম ভারতীয় তথা এশিয়াবাসী হিসেবে ডি.লিট ডিগ্রী লাভ করেন। এই ধারাবাহিকতায় বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হতে থাকে।

দু'দশক আগে প্রতিষ্ঠিত 'অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'র কর্মধারা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চেতনার পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। হাজার বছর ব্যাপী প্রাচীন বাঙালী ঐতিহ্যের আলোকে বাংলা ভাষার সৃজনে ও প্রথম বাংলা কাব্যরচনায় সিদ্ধাচার্যদের অবদানে উদ্বুদ্ধ অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছে। এঁদের কর্মধারা বুদ্ধিজীবিমহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। বেণীমাধব ও ফণীভূষণ স্মারক বক্তৃতামালা প্রবর্তনের মাধ্যমে আজকের এই প্রথম বক্তৃতা অনুষ্ঠানও আর একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্বের মাইলফলক হিসেবে বৌদ্ধ প্রগতির ইতিহাসে স্বাক্ষর রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ, এই জাতীয় স্মারক বক্তৃতামালার প্রচলন বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে এই প্রথম।

এই সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত 'বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতি চেতনার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বমনীষা অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এবং বৌদ্ধ সমাজের অগ্রগতিতে প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট ফণীভূষণ বড়ুয়ার অবদান' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা দানের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য গৌরবান্বিত বোধ করছি। দু'জনেই আমার স্বগ্রাম থেকে উদ্ভূত কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁরা বাংলার বৌদ্ধসমাজের প্রগতিতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাঙালী বৌদ্ধদের শতবর্ষের ইতিহাসে বেণীমাধব বড়ুয়া একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে সমগ্র উপমহাদেশে তথা বিশ্ব সমাজে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছেন। আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া সারাজীবনব্যাপী সমাজ কর্মের স্বীকৃতিতে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতার পর পাকিস্তান গণপরিষদে প্রথম ও একমাত্র বৌদ্ধ সদস্য হিসেবে একটি ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক সময়কালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন।

বেণীমাধব বড়ুয়াকে আমি কখনো দেখিনি। মনে পড়ছে, আমি যখন চট্টগ্রাম কলেজে আই.এ. ক্লাশের ছাত্র তখন ১৯৪৮ সালে তিনি কোলকাতায় পরলোকগমন করেন। আমার চেতনায় আচার্য বেণীমাধব জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত দর্শনশাস্ত্রবিদ হিসেবে কিংবদন্তীপ্রতিম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ফণীভূষণ বড়ুয়াকে আমার কলেজ জীবন থেকে ঘনিষ্টভাবে দেখেছি। পঞ্চাশ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবনে তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের ছায়ায় আমি বিচরণ করেছি এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক মহলে তাঁর অনায়াস বিচরণ দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

'অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'র' উদ্যোগে স্মারক বক্তৃতা প্রচলনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে শিল্পপতি ও লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল-এর ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর রূপম কিশোর বড়ুয়া যথার্থ সমাজ চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন।

জাতীয় উদ্দীপনামূলক আজকের এই মহৎ আয়োজনের জন্য আমি উল্লিখিত সংগঠন ও পৃষ্ঠপোষককে সমাজ সচেতন সুধীসমাজের পক্ষ ও ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দর্শনাচার্য ভারততত্ত্ববিদ বেণীমাধব বড়ুয়া

চট্টগ্রামের অতি ক্ষুদ্র প্রান্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সন্তান বেণীমাধব বড়ুয়া জ্ঞানসাধনা, দর্শনচর্চা ও বহুমুখী পাণ্ডিত্যের জন্য বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রায় ৩৩ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণপূর্ব প্রান্তে চট্টগ্রামে একটি অনগ্রসর সংগ্রামশীল বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী নয়। এই অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে বেণীমাধব বড়ুয়া অন্য দুজন বৌদ্ধ ছাত্রের সাথে সর্বপ্রথম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে এম এ পাশ করেন। অন্য দুজন ছাত্র, মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া (পরবর্তীতে প্রফেসর) ও রেবতী রমন বড়ুয়া (পরবর্তীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)। বেণীমাধব পালিতে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

গুণগ্রাহিতার জন্য প্রবাদতুল্য বাংলার ব্যাঘ্র নামে নন্দিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৩ সালে তরুণ প্রতিভাদীপ্ত বেণীমাধবকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালির অস্থায়ী লেকচারার পদে নিযুক্তি দেন। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জহুরীর মতো সনাক্ত করার অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন স্যার আশুতোষ একই সময়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক সি ভি রমন, বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা প্রমুখকে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। স্যার আশুতোষ পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার পথকে সুগম করার জন্য তরুণ প্রতিভাবান বেণীমাধবকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এখান থেকেই বেণীমাধবের সারা জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চার যাত্রা শুরু হয়।

চট্টগ্রামের রাউজান থানার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামের একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেণীমাধব ১৮৮৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজচন্দ্র তালুকদার পেশায় কবিরাজ ও কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর মা ধনেশ্বরী দেবী স্বগ্রামের জমিদার মেঘবর্ণ মুৎসুদ্দীর কন্যা। পাঁচ ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বেণীমাধবের লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের মডেল স্কুলে। গ্রামের সবুজ স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলে ১৮৯৪ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত আট বছর পিতামাতা ও যৌথ পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর সৃষ্টিশীল সম্ভাবনার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। পারিবারিক ধর্মীয় গুরু পাহাড়তলীর মহানন্দ বিহারের অধ্যক্ষ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে কিশোর বেণীমাধবের মানস গঠিত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁর জীবন গঠনে পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য *Gaya and Buddha Gaya* গ্রন্থের (১৯৩২ সালে প্রকাশিত) ভূমিকায় সংঘরাজ জ্ঞানালঙ্কার বা সাধারণ্যে পরিচিত লালমোহন মহাস্থবিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। একই গ্রন্থে তিনি পিতা রাজচন্দ্র তালুকদার, তাঁর শিক্ষাজীবন গঠনে সহায়তাদানকারী পিতৃব্য ধনঞ্জয় তালুকদার ও একই বংশের পিতামহ জয়লাল বড়ুয়া ও দূর সম্পর্কীয় কাকা সতীশচন্দ্র বড়ুয়াকে তাঁর জীবন গঠনে অবদানের জন্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

গ্রামের মডেল স্কুলে পড়ার সময় কিশোর বেণীমাধব মহামুনি পাহাড়তলী থেকে আরাকানের সংঘরাজ সারমিত্র পরিচালিত সংস্কারান্দোলন ও বৌদ্ধ নবজাগৃতির সাথে পরিচিত হয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্বগ্রামের প্রাতঃস্মরণীয় চাইঙ্গা মহাস্থবির কর্তৃক আরাকানের মহামুনি বুদ্ধমূর্তির অনুরূপ ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি সংস্থাপন ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা এবং পনর দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য মহামুনি মেলা কিশোর বেণীমাধবকে বৌদ্ধধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভাবাবিষ্ট

করেছিল। গ্রামের মডেল স্কুল থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে এম ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চট্টগ্রাম শহরে কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯০৬ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই সালে চট্টগ্রাম কলেজে এফ এ পড়ার সময় অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবিরের কাছে বেণীমাধবের পালি শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদের আদি সংগঠন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির (এখন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি) সভাপতি ও চট্টগ্রাম এনায়েত বাজার বিহারের অধ্যক্ষ ধর্মবংশ মহাস্থবির ১৯০৪ সাল থেকে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও ১৯০৫ সাল থেকে চট্টগ্রাম কলেজে পালির শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। এফ এ (বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট বা আই. এ) পাস করার পর ১৯০৮ সালে যৌথ পরিবারে দায়িত্বশীল সদস্য পিতৃব্য ধনঞ্জয় বড়ুয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে বেণীমাধবের উচ্চশিক্ষার খরচ নির্বাহ করাতে অর্থসংকট দেখা দেয়। দৃঢ়চিত্ত পিতা পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দ্বিতীয় পুত্র কানাইলালকে অর্থ উপার্জনের জন্য রেঙ্গুন পাঠান। তিনি সেখানে সেঙ্গুভ্যালি চা কোম্পানীতে চাকুরি নিয়ে বড় ভাই বেণীমাধবের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করেন। বেণীমাধব বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে অনার্স সহ বি এ পাস করেন। সে সময়ে যশস্বী দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিতে ভর্তি হয়ে ১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। কৃতিত্বের সাথে এম এ পাশ করার সাথে সাথে বাংলার শিক্ষাজগতের দিকপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষের দৃষ্টি প্রতিভাবান বেণীমাধবের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সংসার জীবনে তিনি স্বগ্রাম মহামুনি পাহাড়তলীর পঙ্কজাসুন্দরী বড়ুয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পঙ্কজাসুন্দীর বাবা ও মা যথাক্রমে দয়াধন ও উমাবতী বড়ুয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাপিতাং বংশের উত্তরসূরি। ড. বড়ুয়ার তিন পুত্র ও চার কন্যা কৃতী ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মধ্যে বড় ছেলে বসুবন্ধু বড়ুয়া ব্যাংকে উচ্চপদে চাকুরি করেছেন। ড. অরুণ বড়ুয়া, অধ্যাপক, বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউট; ড. অশোক বড়ুয়া, ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স; কন্যা ড. অনিতা পাকড়াশী, ডেপুটি ডিরেক্টার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিকেল বায়োলজী এবং ড. মাধুরী মুখার্জি, অধ্যাপিকা লেডি ব্রাবোন কলেজ। জ্যেষ্ঠা কন্যা কনকচাঁপা দেবী মেধাবী ও উচ্চশিক্ষিত।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষীণ শিখা দীপ্যমান ছিল। চট্টগ্রামের ছাত্র জীবনে বেণীমাধব তালুকদার পারিবারিক 'তালুকদার' পদবী বর্জন করে বৌদ্ধদের ঐতিহ্যবাহী 'বড়ুয়া' পদবী গ্রহণ করে ধর্মীয় পরিচয় ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় দেন। ধর্মের সারতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রচলিত পূজা আচার বা তন্ত্রমন্ত্রের চেয়ে ধর্মের মূল নীতিকেই তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। পরবর্তী জীবনে নিজের বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করে তিনি লিখেছেন "কোন ধর্মমতই আমাকে আকৃষ্ট করেনা, যদি তার লক্ষ্য মুক্তি না হয়। পুরোহিত সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত এবং সম্প্রদায়গত ধর্মের দিন ফুরিয়ে এসেছে, যদি তা একেবারে শেষ না হয়ে থাকে। বর্তমান যুগের যুব সম্প্রদায় সেই ধর্মকেই চায় যে ধর্ম ব্যক্তিগত বটে, সার্বজনীনও বটে, যে ধর্ম যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক।"

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে চতুর্থ দর্শকের শেষভাগ পর্যন্ত (১৯১৩ থেকে ১৯৪৮) তিনি ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, শিলালিপি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক বিষয়ে গবেষণা করে যে মৌলিক অবদান রেখেছেন, তা আজো বিদ্বৎসমাজকে নব নব চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করছে।

তরুণ বেণীমাধব পরবর্তীকালে তাঁর শাস্ত্রচর্চা ও গবেষণা কর্মে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মুক্তবুদ্ধি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করার পর ভারতে বৌদ্ধ নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত চট্টগ্রামের প্রথিতযশা ভিক্ষু কোলকাতায় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি ও ধর্মাঙ্কুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির ও স্যার আশুতোষের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিভাবান বেণীমাধব লন্ডনে উচ্চতর গবেষণাকর্মের জন্য সর্বপ্রথম ভারতীয় হিসেবে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হন। এক অতি ক্ষুদ্র প্রান্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিভাবান বেণীমাধব ব্রিটিশ সরকারের স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে ১৯১৪ সালে ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন। কোলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে একটি স্মরণীয় বিদায় সংবর্ধনায় শ্রীলঙ্কার কীর্তিমান সন্তান উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে প্রায়-অবলুপ্ত বৌদ্ধধর্মের নবজাগৃতির পুরোধা অনাগারিক ধর্মপাল তাঁর ভাষণে বলেন-'চট্টলাবাসী বৌদ্ধ যুবক বেণীমাধবের গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত। ইহা ভারতীয় বৌদ্ধদিগের পক্ষে এক নবযুগে প্রবেশারম্ভের সূচনা।' সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির বলেন, 'আমরা বৌদ্ধ সমাজ বড় হীনাবস্থায় ছিলাম। আজ আমাদের স্নেহের বেণীমাধব সত্য সত্যই আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজকে অনেক উন্নীত করিলেন। বেণীমাধবের এই গৌরবে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ গৌরবান্বিত এবং এই হেতু ধর্মাঙ্কুরের সম্পাদকরূপে তিনি আমাদের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই হেতু ধর্মাঙ্কুর সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমাদের আশীর্বাদসহ এই অভিনন্দনপত্র প্রদান করিতেছি।' (জগজ্জ্যোতি, কলিকাতা, ১৩২১ বাংলা) বেণীমাধব তাঁর বক্তৃতায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উপসংহারে বলেন, 'আমার বিদায়ে দুঃখ করিবেন না। আমি বাঁচিব, আবার আসিব, বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। এই জন্যই দরিদ্রের গৃহে আমার জন্ম'(জগজ্জ্যোতি, ১৯৮৯ ড. বি এম বড়ুয়া জন্মশতবার্ষিকী স্মরণ সংখ্যা)।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যুবক বেণীমাধবের সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ইংল্যাণ্ড যাত্রার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সমাজের গভীর আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

মাত্র ২৬ বছরের যুবক বেণীমাধব লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিবর্তনের উপর মৌলিক গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হন। এখন থেকেই বেণীমাধবের দার্শনিক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল : *Indian Philosophy : its origin and growth from the Vedas to the Buddha.* প্রায় তিন বছরব্যাপী গবেষণায় তিনি গ্রীক দর্শন ও আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত জৈন ও বৌদ্ধ [illegible], বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, আরণ্যক, ভগবতগীতাসহ বিভিন্ন আকর গ্রন্থ পাঠ করে তাদের মূল তত্ত্ব অনুধাবন করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় দর্শনের অধ্যাপক হিকস, বৌদ্ধ শাস্ত্রে অসামান্য পণ্ডিত ড. রিজ ডেভিডস ও মিসেস ডেভিডস এবং এফ ডবলু টমাস প্রমুখ ভারততত্ত্ববিদদের কাছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্তের পাঠ গ্রহণ করেন। প্রায় তিন বছরব্যাপী নিরন্তর পড়াশুনা, অনুশীলন ও গবেষণার ফলশ্রুতিতে তিনি ভারতের বৈদিক যুগে আর্যদের আগমনের সময়কাল থেকে বুদ্ধের আবির্ভাব পর্যন্ত এক হাজার বছরব্যাপী প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব, বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা কর্মে সাফল্য লাভ করেন। এই দার্শনিক গবেষণা কর্মের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৭ সালের ১৮ জুলাই বেণীমাধব বড়ুয়াকে ডি. লিট. ডিগ্রিতে ভূষিত করেন। ড. বড়ুয়া ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম ডি. লিট, এমনকি এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আরো চার বছর পর ১৯২১ সালে আরো দুজন

প্রতিভাবান ভারতীয় বাঙালি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' এবং সুশীল কুমার দে 'সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাস ও রসশাস্ত্রের বিবরণ' শীর্ষক গবেষণা কর্মের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময়কালে আরেকজন অসামান্য মনীষী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের উপর গবেষণাকর্মের জন্য প্যারিসের সোবর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনায় বেণীমাধব বড়ুয়া পথিকৃৎ। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুকুমার সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের *History of Indian Philosophy* প্রকাশিত হয় *Cambridge* থেকে ১৯২২ সালে, আর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের *Indian Philosophy* গ্রন্থ *London* থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং ড. বেণীমাধব বড়ুয়াকে ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্ত রচনার দিক থেকে পথিকৃৎ বলে আমরা দাবী করতে পারি। ডক্টর বড়ুয়ার পূর্বে কোন ভারতীয় পণ্ডিতের এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।' (নালন্দা, কোলকাতা, পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিদ বেণীমাধব বড়ুয়া)।

ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪৮ সালে ২৩ মার্চ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় অধ্যক্ষের দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন। এ ছাড়াও ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এবং ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সংস্কৃত বিভাগে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এবং শিলালিপি বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

আচার্য বেণীমাধব সমগ্র জীবনব্যাপী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি, শিলালিপি, ভাস্কর্য , প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মবিজয়ী সম্রাট অশোকের কীর্তি ও জীবনকথা এবং বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে ইংরেজীতে ১৮টি মৌলিক গ্রন্থ, বাংলায় ৭টি গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকায় ইংরেজিতে ৮৬টি তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ ও বাংলায় ২২টি প্রবন্ধ রচনা করে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

ভারততত্ত্ব, শিলালিপি, প্রত্নতত্ত্ব ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সামগ্রিকভাবে নিমগ্ন আচার্য বেণীমাধবের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *Prolegmena to Buddhist Philosophy.* ১৯১৮ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠার এই বইতে ১২টি লিখিত বক্তৃতামালার মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে ঃ পশ্চিমী চিন্তার সাথে ভারতীয় মননচিন্তার সম্পর্ক, আধুনিক ভারতে বৌদ্ধধর্মের সাধারণ আকার, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০৫০ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বৌদ্ধ দর্শনের সাথে শংকরের সম্পর্ক, বুদ্ধের কার্যকারণ তত্ত্বের দ্বিবিধ স্বরূপ, বুদ্ধের অনাত্মবাদ প্রভৃতি। ১৯২০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত The Ajivakas শীর্ষক তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে প্রাচীন ভারতের আজীবক ও পরিব্রাজক সম্প্রদায়ভুক্ত তীর্থঙ্করদের জীবন চরিত, আচার-অনুষ্ঠান, সাধনপদ্ধতি ও মতবাদসমূহ সংস্কারমুক্ত নির্লিপ্ত দৃষ্টি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ড. বেণীমাধবের তৃতীয় গ্রন্থ *A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy 1921* সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি.লিট. ডিগ্রির জন্য রচিত গবেষণা কর্মভিত্তিক এই অসাধারণ গ্রন্থে আচার্য বেণীমাধব বুদ্ধের দর্শনকে যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য আর্যদের ভারত আগমনের পর থেকে বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত প্রাচীন

ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব ও বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ইতিহাসের কোন ঘটনা কার্যকারণ বিহীন বা দৈব কারণে উদ্ভূত নয়। প্রাচীন দর্শনের প্রবহমান স্রোত থেকে বিবর্তনের ধারায় বৈদিক, বেদোত্তর ও নব্যবৈদিক চিন্তাধারার এক হাজার বছরব্যাপী বিবর্তনের ফলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ট শতকে বুদ্ধ তাঁর যুক্তিবাদী নিরীশ্বরবাদী দর্শন এর ব্যাখ্যা করেছেন। বৈদিক দর্শনের সৃষ্টিকেন্দ্রতাত্ত্বিক ভাবনা, বেদোত্তর দর্শনের মনস্তাত্মিক ব্যাখ্যা, নব্যবৈদিক দর্শনের বেদ-বিরোধী ভাবনা তথা ব্রতশীল সম্পর্কে তর্ক বিচার - এ প্রেক্ষিতে বুদ্ধ তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণনির্ভর দর্শনকাঠামো নির্মাণ করেছেন। ড. বড়ুয়া পূর্ববর্তী *Dogmatic* ভাবনার বদলে বৌদ্ধ দর্শনকে *Dialectic* বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠার ভারতীয় দর্শন সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি প্রধানত চারভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বৈদিক যুগের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত দুশত বছরব্যাপী আলোচনায় ড. বড়ুয়া লিখেছেন, তখনকার আর্য ঋষিরা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত বিষয় ছন্দময় ভাষায় রচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসায় বেদোত্তর দর্শনের বিকাশ ঘটেছে। তৃতীয় ভাগকে নব্য বৈদিক বা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যুগ বলে অভিহিত করে ড. বড়ুয়া জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ও বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনের বিকাশে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে। এ সময়ে দার্শনিকেরা বেদকে গুরুত্ব দিলেন না। নীতিবাদী বলে শ্রেণীভুক্ত দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধের সমসাময়িক, তাদের অনেকের সাথে বুদ্ধের বাদানুবাদ হয়েছে।

প্রথম ভাগে ভারতীয় দর্শনের আদিকাল বৈদিক যুগের আলোচনায় ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া প্রাচীন ঋষিদের সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে আলোচনান্ত প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় প্রকাশে নিত্য- নৈমিত্তিক ঘটনা প্রবাহ-সূর্যের তেজ, চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্ত, ঝড়, বৃষ্টি, উত্তাপ, শৈত্য, দিবা-রাত্রির পরিক্রমা কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে বৈদিক ঋষিদের মনে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে। ঋগ বেদের ছন্দময় ভাষায় স্তোত্রসমূহের মাধ্যমে বিশ্বজাগতিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কিত বিষয়ে ঋষিরা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। এই বৈদিক যুগের সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত প্রসারিত। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক দর্শনে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ভাবনা এই সব ঋষিদের চিন্তাকে আন্দোলিত করেছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বেদোত্তর দর্শনের বিবর্তন বর্ণিত হয়েছে। খ্রিষ্টপূব ১৩০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সময়কালের দার্শনিকদের চিন্তা প্রধানত মনস্তত্ত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এ যুগের দার্শনিকদের চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে উত্তর-বৈদিক যুগে ঋষিদের অন্বেষা হলঃ মানুষ কি করে ব্রহ্মের সাথে, পরমাত্মার সাথে, অনন্তের সাথে মিলিত হতে পারে এবং সমগ্র জগতের মধ্যে ঐক্যের সূত্র কি। এই সময়ে হোম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান দিয়ে মানুষের ঐহিক ও পরমার্থিক পরিত্রাণের কথা বলা হয়েছে। মানুষ ও অবশিষ্ট জগতের মধ্যে ঐক্যের নির্দেশনা বিষয়ে দীর্ঘতমার চিন্তাধারা থেকে বেদোত্তর কালের দর্শন বিকশিত হয়েছে। উত্তর-বৈদিক দার্শনিকদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনায় তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীর সাথে কথোপকথনের মধ্যে ডঃ বড়ুয়া যাজ্ঞবল্কের আত্মকাম, পাপ-পুণ্যের ধারণা, বিদ্যা-অবিদ্যার কথা, ঈশ্বরের স্বরূপ, আত্মার প্রবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করেছেন। এ প্রেক্ষিতে পৃথিবী অসীম কি সসীম- এ বিষয়ে 'ব্রহ্মজাল সূত্রে' বর্ণিত বুদ্ধের মতবাদ তিনি আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় ভাগকে নব্য-বৈদিক যুগ বা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে জৈনধর্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর ও বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেকার দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সময়কালের (খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ) চিন্তাধারায় ভারতীয় দর্শনে নতুন দৃষ্টিভংগির পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁরা যজ্ঞ ও পশুবলির বিরুদ্ধে দৈনন্দিন জীবনে ব্রত, শীল ও নীতি পালনের কথা বলেন। এসময়কার নীতিবাদীদের দর্শনে ঈশ্বর, কাল বা নিয়তির স্থান নেই। তাঁরা একান্ত সুখকেই সর্বোত্তম কাম্যবস্তু বলেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম বলে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতেন। এখানে বুদ্ধের সাথে তাঁদের মতবিরোধ। বুদ্ধ বল্‌লেন, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম নিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, কুশলকর্ম ও সুকৃতির দ্বারা জন্মে অব্রাহ্মণ হলেও যে কেউ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারেন, বরং দুস্কৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণও 'বৃষল' আখ্যা লাভ করতে পারেন।

এ যুগের ঋষি আসুরির ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদ বুদ্ধ খণ্ডন করেছেন। আসুরির মতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সব কিছুর স্রষ্টা, অনন্ত, অসীম ও অপরিবর্তনশীল। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বুদ্ধের দর্শন ব্যাখায় লিখেছেন ঃ বুদ্ধ আসুরির এই তত্ত্ব খণ্ডন করে প্রতিপন্ন করেছেন যে কার্যকারণ শৃংখলে আবদ্ধ বিশ্বচরাচর নিত্যপরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হচ্ছে। ডঃ বড়ুয়ার ভাষায় ঃ

Buddha could not conceive of any such unchangeable and omnipotent individual as being fully real by himself. For him the world of generation was a constant cycle of change (rather than existence) - a continuous process of evolution and revolution, of envelopment and development.

বুদ্ধ বিশ্বসৃষ্টির বিষয় এবং মানবজীবনের ঘটনাপ্রবাহকে একটি যুক্তিগ্রাহ্য কার্যকারণ নিয়মের কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

চতুর্থভাগে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের দর্শনে তাঁর নিরীশ্বরবাদ এবং জড় কিংবা অজড় নির্বিশেষে সকল সত্তার মধ্যে প্রাণের প্রকাশ বিষয়ে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া পর্যালোচনা করেছেন। 'অহিংসা' মহাবীরের মূলমন্ত্র, জড় বা অজড় কাকেও হিংসা করা পাপ। ডঃ বড়ুয়ার বক্তব্য হচ্ছে ঃ বৈদিক যুগ থেকে উত্তর-বৈদিক যুগ ও নব্য-বৈদিক যুগ অতিক্রম করে মহাবীর-বুদ্ধের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনের গতি কখনো থেমে যায়নি, বরং বুদ্ধের যুগে এসে তা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। দার্শনিক চিন্তার এই ক্রমবিবর্তনে পুরনো দর্শনও নতুন দর্শনের উপর ছায়া বিস্তার করেছে। প্রত্যেক যুগে নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবধারার উদ্ভব ঘটেছে, কিন্তু পুরোনটাও সাথে সাথে চলেছে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, সংঘাত-সমন্বয়ের পথ ধরে পরবর্তী দর্শনসমূহের বিকাশ লাভ ঘটেছে।

প্রাগ-বুদ্ধ যুগের মতবাদকে খণ্ডন করে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা, বিশ্লেষণ, যুক্তি ও কার্যকারণ নীতির আলোকে তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শনকে উপস্থিত করেছেন। ডঃ বড়ুয়া বৈদিক দর্শনকে বিশ্বচরাচর সম্পর্কিত, বেদোত্তর চিন্তাকে শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক এবং নব্য-বৈদিক দর্শনকে নীতিবাদী আখ্যায়িত করে বলেছেন, পুরোন ধারণা নতুন ধারণাকে যেমন প্রভাবান্বিত করেছে, তেমনি নতুন দর্শন পুরনো দর্শনের ধারাকে পরিবর্তন করেছে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের এই ক্রমবিবর্তনের ধারায় মহাবীর ও বুদ্ধ কর্মতত্ত্বের দিক থেকে এক ধরনের চিন্তার অনুসারী এবং কেউ গোঁড়া বা সংশয়বাদী নন। তবে বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোকে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ দর্শনের সাথে মহাবীরের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ড বড়ুয়ার এই গ্রন্থের উপসংহারে বক্তব্য

হচ্ছে ঃ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাভাবনার মধ্যে ধারাবাহিকতা ও প্রগতি ছিল। নতুন ধ্যানধারণার আবির্ভাবে পুরোনোটা নস্যাৎ হয়ে যায়নি। বরং দুটো পাশাপাশি চলেছে অথবা একটা অপরটার পরিপূরক হয়েছে। ক্রমবিবর্তনের ধারায় নানা চিন্তা ও দর্শনের সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে। *A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy* গ্রন্থের উপসংহারে আচার্য বেণীমাধবের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: ভারতীয় দর্শন পর্যালোচনায় বেদ থেকে শুরু করে ক্রমবিবর্তনের এমন একটি ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়, যার আলোকে মানবচিন্তার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক ধারা ও প্রগতিকে অবলোকন করা সম্ভব। তিনি বলেছেন, মৃত অতীতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া তাঁর লক্ষ্য নয়, বরং শ্রমের সাথে ইতিহাসের যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়াসে বলা যায়, ইতিহাসে যা ঘটেছে তাই সত্য এবং যা হওয়া উচিত ছিল তা নয়। এই সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতির অতীত ইতিহাস মূল্যায়নে প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থ কেবল বিপুল জ্ঞানরাশির সমাহার না হয়ে প্রাণবন্ত সরসতায় ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের দীপ্তিতে মননশীল পাঠককে এখনো মুগ্ধ করতে সক্ষম।

১৯২৩ সালে মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিকে আশ্রয় করে আচার্য বেণীমাধব তাঁর সহযোগী অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের সাথে যৌথভাবে *Prakrit Dhammapad* এর সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন। এই বইতে তিনি ধর্মপদের সাথে মধ্য এশিয়ার খরোষ্ঠী ভাষায় লিখিত ধর্মপদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে গবেষণার জন্য বেণীমাধব শিলালিপির পাঠোদ্ধারে ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ইংরেজ মনীষী জেমস প্রিন্স (১৭৯৯-১৮৪০) ১৮৩৪ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে খোদিত ব্রাহ্মী ভাষার পাঠোদ্ধার করে প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাসের অনেক অনুদঘাটিত দিককে উন্মোচিত করেছেন। আচার্য বেণীমাধব তাঁর পূর্বসূরির পথ অনুসরণ করে দুর্গম অরণ্যে ও গিরিগুহার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করে অনেক শিলালিপি, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অনুলিপি সংগ্রহ করেন এবং জটিল রহস্যময় লিপিতে লেখার অর্থ আবিষ্কার করে ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের উপর আলোকপাত করেন। সম্রাট অশোকের শিলালিপি পাঠোদ্ধার করে ১৯২৬ সালে তিনি *Old Brahmi Inscriptions in the Udaygiri and Khandagiri Caves* গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। একই সময় কুমার গঙ্গানন্দ সিংহের সাথে তিনি *Barhut Inscription* শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন, যা ১৯২৬ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রাচীন খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী ভাষার শিলালিপির অর্থ উদ্ধার করে তিনি সম্রাট অশোকের ধর্মাভিযানের মর্মকথা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যসুষমামণ্ডিত ভাষায় অশোকলিপি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ ***'জগতের মধ্যে সম্রাট অশোক আপনার যে কথাগুলোকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুঁদিয়া দিয়াছেন পাহাড় কোনকালে মরিবেনা, ভাবিয়াছিলেন সরিবে না, অনন্তকাল পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন ... পাহাড় সেদিনকার সেই কথা কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে।*** আচার্য বেণীমাধব অশোকের শিলালিপির ভাষার মর্ম উদ্ধার করে *Asoka Edicts in the New Light* বইটি রচনা করেন এবং ১৯২৬ সালে সেটা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ সময়ে তিনি *Indian Historical Quarterly* নামে গবেষণা পত্রিকায় *Inscriptional Excursions* শীর্ষক ধারাবাহিকভাবে দশটি নিবন্ধ প্রকাশ করে অনেক পণ্ডিতের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা খণ্ডন করেন। প্রাচীন শিলালিপি ব্যাখ্যায় আচার্য

বেণীমাধবের এ সব প্রবন্ধের মৌলিকতা সম্পর্কে ড. নলিনাক্ষ দত্ত লিখেছেন ঃ ***এ প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উদয়গিরি ও খন্ডগিরি শিলালিপির যে বিচার তিনি করিয়াছেন তাহা অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচায়ক এবং তাঁহার ব্যাখ্যা আজকাল প্রায় সকল প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রহণ করিয়া থাকেন (জগজ্জ্যোতি, কোলকাতা, ১৩৫৯ বাংলা)***। ১৯৩১ সালে আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া *Gaya and Buddha Gaya* প্রথম খন্ড এবং ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করেন। এ সময়েই তিনি বারহুত স্তূপের স্থাপত্যকর্মের উপর *Barhut Volumes I, II & III* রচনা করে বৌদ্ধ শিল্প, স্থাপত্য, শিলালিপি ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রাখেন। উল্লেখ্য যে ১৮৭৩ সালে প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ জেনারেল স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভূপালে বারহুত স্তূপ আবিষ্কার করেন। ড. বড়ুয়ার গবেষণার মৌলিকতা বিষয়ে ড. সাধন সরকার লিখেছেন: 'বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন ছাড়া তাঁর বলিষ্ঠ পদচারণার আরেকটি ক্ষেত্র বৌদ্ধভাস্কর্য ও কলা। .... ড. বড়ুয়া বৌদ্ধ ভাস্কর্যশিল্পে নুতন নুতন ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যায় মূর্ত করলেন। তাই বৌদ্ধ ভাস্কর্যবিষয়ক তাঁর সমালোচনা ও বিবরণ সব সময়ই ড. বড়ুয়ার মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে। ভাস্কর্যসমালোচনা গ্রন্থগুলোর মধ্যে *Gaya and Buddha Gaya, Old Shrines of Buddha Gaya* এবং *Barhut Volumes I, II & III* - সর্বাপেক্ষা মৌলিকতার দারী রাখে। তিনি এই সব গ্রন্থে তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে অনেক জায়গায় ভিন্নমত পোষণ করে নিজস্ব বিচারসত্তাকে সাহিত্যিক সুষমামণ্ডিত করেছেন। তাঁর এই মৌলিক চিন্তাধারার নিঃসন্দেহে প্রেরণা পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য (নালন্দা পত্রিকা, কোলকাতা, ১৯৯০ সালের প্রবন্ধ থেকে)। আচার্য বেণীমাধব ইতিহাস, শিলালিপি, প্রত্নতত্ত্বচর্চার মধ্যে সম্রাট অশোক সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা করে *Inscriptions of Asoka* গ্রন্থ দু'খন্ডে প্রণয়ন করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৩ সালে *Part I* এবং ১৯৪৫ সালে *Part II* প্রকাশ করে। পরে গবেষণালব্ধ গ্রন্থ *Asoka and his Inscriptions* নামে বৃহদাকার গ্রন্থটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। ত্রিপিটক, দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধসাহিত্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, জৈন সাহিত্যের সাক্ষ্য, চৈনিক ও গ্রীক লেখকদের মন্তব্য মন্থন করে ড. বড়ুয়া অশোকের শিলালিপির মূল্যায়ন করেছেন এবং তাঁর ধর্মবাণী, ধর্মবিজয়, ব্যক্তিগত ইতিহাস, রাজ্যশাসন প্রণালী, সমকালীন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। ড. বড়ুয়া অশোকের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ বাণীর মর্মার্থ ব্যাখ্যার জন্য ত্রিপিটকে ব্যাখ্যা ও বুদ্ধবচনের সাথে অশোকবচনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পরিশ্রমী গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করেছেন।

শ্রীলঙ্কার বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক আনন্দ গুরুগে তাঁর এক প্রবন্ধে আচার্য বড়ুয়ার বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে অশোকবিষয়ে যে গ্রন্থ লিখেছেন, সেটাকে অশোকসম্পর্কিত সবচেয়ে বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজের কাছে এই বইটি যথার্থ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। গভীর জ্ঞান, বিচিত্র তথ্যসমূহের মধ্যে বিচরণের দক্ষতা ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আচার্য বেণীমাধব সম্রাট অশোক বিষয়ে গবেষণারত পণ্ডিতদের মধ্যে অসামান্য স্থান অর্জন করেছেন।

১৯৪৪ সালে পরিণত বয়সে আচার্য বেণীমাধব সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় ও ডোনা আলপিন ট্রাস্টের যৌথ আমন্ত্রণে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) যান। থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান সফর করার সময়ে তিনি তাঁর প্রথম বক্তৃতা *India and Ceylon* এ সিংহলকে তাঁর কৈশোরের স্বপ্নের দেশ বলে অভিহিত করেন। ১৯৪৪ সালের ২২ মার্চ প্রদত্ত এই বক্তৃতায় তিনি নিজের পরিচয় ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে চট্টগ্রামের এক

নিভৃত প্রান্তে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদ্ধর্ম রক্ষার করুণ সংগ্রামের কথা বলেন। প্রথম বক্তৃতায় বলেন ঃ *Unworthy as I am, I felt that with me was somehow or other bound up the honour of two great institutions, that with me were inseparably linked the unbroken cultural heritage of Bharatvarsh, the enviable cultural past and present of Bengal and no less the Sadhana of my native district Chittagong and the pathetic story of the struggle of my people for keeping burning the lamp of Saddhamma in the secluded corner against tremendous odds* অর্থাৎ, অযোগ্যতার মধ্যেও আমি অনুভব করেছি যে দুটো মহান প্রতিষ্ঠানের সম্মান কোন না কোন ভাবে আমার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। আমার মধ্যে প্রোথিত রয়েছে ভারতবর্ষের অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বাংলার ঈর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অতীত ও বর্তমান এবং কোন মতে কম নয়, আমার জন্মসূত্রে সম্পৃক্ত চট্টগ্রাম জিলায় এক নিভৃত প্রান্তে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে সদ্ধর্মের দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখার জন্য স্বগোত্রীয়দের সংগ্রামের করুণ কাহিনী (ভাবানুবাদ)।

সিংহলী বিদ্বৎসমাজে নন্দিত ব্যক্তিত্ব আচার্য বেণীমাধব সিংহলের ইতিহাসে বৌদ্ধপ্রভাব সম্পর্কিত তিনটি বক্তৃতায় এবং বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ক পাঁচটি বক্তৃতায় বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের মর্মকথা গভীর পান্ডিত্যের সাথে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। সিংহলের সুধীসমাজ, ভিক্ষুসংঘ ও পণ্ডিতমন্ডলী আচার্য বেণীমাধবের বৌদ্ধধর্মে প্রগাঢ় দার্শনিকতাবোধ ও অসামান্য পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং বিদ্যালঙ্কার পরিবেনের (বিশ্ববিদ্যালয়) সবুজ শালবৃক্ষের নিচে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বেণীমাধব বড়ুয়াকে 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

ইতিহাসে তিনজন বাঙালি সিংহল বা শ্রীলঙ্কা থেকে বিশিষ্ট উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে মধ্যযুগের বাংলায় 'ভক্তিশতক' গ্রন্থের প্রণেতা শ্রী রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু কর্তৃক 'বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। পালিভাষা, সাহিত্য ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার পৃষ্ঠপোষক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সিংহলের অমরাপুর নিকায়ের মহানায়ক রাজগুরু শ্রীমৎ সুভূতি মহাস্থবির 'সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় ব্যক্তি অসামান্য বাঙালি পন্ডিত ড. বেণীমাধব বড়ুয়াকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতন বিদ্যালঙ্কার পরিবেন বা বিশ্ববিদ্যালয় 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এটা জীবনসায়াহ্নে একটি থেরবাদী বৌদ্ধদেশের পীঠস্থান শ্রীলঙ্কা থেকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য ড. বেণীমাধবের প্রতি আরেকটি বিরাট স্বীকৃতি। বিশ্ববৌদ্ধ ফেলোশিফের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রফেসর ড. গুণপাল পিয়সেন মালালাশেখরের সৌজন্যে ১৯৪৪ সালে ড. বড়ুয়া সে দেশের বৌদ্ধ সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদের এবং বিদ্বতমণ্ডলীর সাথে এক সম্বর্ধনা চা চক্রে মিলিত হয়েছিলেন। সিংহল মহাবোধি সমিতির উদ্যোগে একটি জনসভায় তাঁকে যেভাবে অভিনন্দন জানান হয়, তাতে তিনি অভিভূত হন। দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ড. বি আর ভান্ডারকর, ড. কালিদাস নাগ, ড. নীহাররঞ্জন রায় ও ড. শ্রীমতি বি কে সরকার ঐ সভায় ত্রিপিটকাচার্য বেণীমাধব বড়ুয়াকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন জানান। সিংহলে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সংকলন *Ceylon Lectures* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আচার্য বেণীমাধব রচিত শেষ ইংরেজী গ্রন্থ *Philosophy of Progress* ১৯৪৮ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত দর্শনকে প্রতিভাত করেছেন।

পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর প্রায় ২৫ বছর পরে ১৯৭৪ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ক ১২টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে Studies in Buddhism শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরীর (ব্যক্তিগত সম্পর্কে ড. বেণীমাধবের ভাগিনেয়) সম্পাদনায় সিংহলে প্রদত্ত বক্তৃতামালা ও বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কিত আরো কয়েকটা প্রবন্ধ নিয়ে *Studies in Buddhism* শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। ১৯৫৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেণীমাধব শতবর্ষ গ্রন্থে আরো তিনটি ইংরেজি বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোর নাম হল ঃ *(1) Chakma Taras from Chittagong Hill Tracts (2) Manuscripts of Dhamma Samuccay (3) Burmese Manuscripts of later Pali works.* ইংরেজিতে তিনি গবেষণামূলক ৮৬টি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বৌদ্ধদর্শন, শিলালিপি ও ভাস্কর্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে নানা জটিল তত্ত্ব সম্বলিত এই সব প্রবন্ধ বিভিন্ন উচ্চমানের সাময়িকী, স্মারক গ্রন্থ ও নানা বইয়ের ভূমিকারূপে প্রকাশিত হয়েছে।

আচার্য বেণীমাধব বাংলায় সাতটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ২২টি তত্ত্বমূলক গবেষণানিসৃত প্রবন্ধ লিখেছেন। বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে লোকগীতি, মনিরত্নমালা ও গৃহী বিনয় কোলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা থেকে ১৯১২, ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। অন্য তিনটি গ্রন্থ হচ্ছে ঃ বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি (১৯২৩ সালে প্রকাশিত), বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ, প্রথম ভাগ (ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত) এবং মধ্যমনিকায় (যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড কর্তৃক ১৯৪০ সালে প্রকাশিত)।

চট্টগ্রামের তথা বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের ইতিহাস রচনার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু জীবনের ৩৫ বছরব্যাপী ইংরেজিতে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় নিয়োজিত থাকার জন্য স্বল্পায়ু জীবনে সব কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। এমন বিরাট একজন প্রতিভাশালী পণ্ডিতের রচনা থেকে বৌদ্ধ সমাজের নানা অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব ছিল। তাঁর রচিত বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি নামে বইয়ের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন যে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডন থেকে স্বদেশে ফিরে এলে চারটি বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ঃ (১) চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের ইতিহাস সংগ্রহ, (২) বৌদ্ধ গৃহী বিনয় সংকলন, (৩) বড়ুয়া আইন সমস্যার মীমাংসা এবং (৪) প্রচলিত বৌদ্ধ বিবাহমন্ত্রের সংশোধন। জীবনব্যাপী বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নিমগ্নতার জন্য তিনি উল্লিখিত কাজগুলির দিকে মনযোগ দিতে পারেননি। তবে বৌদ্ধ বিবাহ সম্পর্কে বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি বইতে তিনি স্বগোত্রীয় বৌদ্ধ সমাজের সমকালীন চিত্র তুলে ধরেছেন। এই ছোট বইয়ের প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকাতে তিনি চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় আচার, লোকজ বিশ্বাস ও তার সাথে সমাজের যোগসূত্র, সমকালীন সমাজ গঠনের স্বরূপ একজন সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সমকালীন বৌদ্ধ সমাজের ধর্মীয় আচার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে তিনি এ বইয়ের ভূমিকায় বৌদ্ধদের মধ্যে নানাবিধ ভয়, নানাবিধ দুঃখ, অশান্তি ও উপদ্রব নিবারণ ও সর্ববিধ মঙ্গল নিবারণের জন্য পরিত্রাণ সূত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন যে এসব পরিত্রাণ মন্ত্র লৌকিক বৌদ্ধধর্মের এক প্রকার দেববাদ, মন্ত্রবাদ ও নামবাদ সূচনা করে। এই বইতে বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজের পরিত্রাণ মন্ত্র ও চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত আগরতারা প্রসঙ্গে ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিত্রাণ ও ধারণীর উদ্ভব ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম একটি মন্ত্রবাদ, দেববাদ ও নামবাদ পর্যবসিত হইয়াছে। যত অঘটন ঘটিয়াছে। বস্তুত যেভাবে ক্রমে ক্রমে

নীতিবাদ পশ্চাতে সরিয়া মন্ত্রবাদ প্রভৃতি তান্ত্রিকতা সম্মুখে আসিয়া হিন্দু বা আর্য গুহ্য-ধর্মের অনুরূপ একটি লৌকিক বৌদ্ধধর্ম সৃজন করিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করাই বৌদ্ধ ঐতিহাসিকের কর্তব্য।"

এই ছোট বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠা ভূমিকায় বেণীমাধব বড়ুয়া সমকালীন বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তার আলোকে উনবিংশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সংঘরাজ সারমিত্রের বৌদ্ধ সংস্কারআন্দোলনের আলোকে থেরবাদী ধর্মের বিকাশকে অনুধাবন করাই যথার্থ। 'বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি' বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাঁর স্বগ্রাম মহামুনি পাহাড়তলীর শরৎচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত বিবাহ মন্ত্র বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্র বা শুভ বিবাহ মন্ত্র সংস্কারবাদী সংঘরাজ সারমিত্রের পরবর্তী সংঘরাজ আচার্য চন্দ্রমোহন মহাস্থবির বৌদ্ধ পালি সূত্র অবলম্বনে যথাবিহিত সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। এই ছোট তত্ত্বমূলক বইটি একটি অসাধারণ সামাজিক ডকুমেন্ট হিসেবে মনীষী বেণীমাধবের মেধাবী সত্যসন্ধী বিশ্লেষণ প্রতিভাত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই ছোট বইতে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁর লেখক জীবনের গোড়াতে স্বগোত্রীয় বৌদ্ধসমাজের সমকালীন ছবি তুলে ধরেছেন। বৌদ্ধ সমাজ সম্পর্কে তাঁর উল্লিখিত বাকি তিনটি বিষয়ে তিনি কোন বই লিখে যেতে পারেন নি। তবে তাঁর লেখা কিছু নিবন্ধে এবং অভিভাষণে এই সব বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

বাংলাতে তিনি আরো দুটো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। একটি ১৯৩৬ সালে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউড কর্তৃক প্রকাশিত 'বৌদ্ধ কোষ গ্রন্থ' এবং অন্যটি ১৯৪০ সালে প্রকাশিত ত্রিপিটকের 'মধ্যম নিকায়' গ্রন্থের ভূমিকাসহ বাংলা অনুবাদ।

তাঁর সমাজচিন্তার বাহন হিসেবে প্রায় ২২টি প্রবন্ধ বা অভিভাষণ প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৫ সালে কোলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান'। এ দীর্ঘ নিবন্ধে তিনি চট্টগ্রামের প্রান্তসীমায় যেসব বৌদ্ধ গুণীজন কাব্য, সাহিত্য ও ধর্ম সাধনা করেছেন তাঁদের অবদানকে মূল্যায়ন করেছেন। এ সব গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেনঃ "বৌদ্ধ রঞ্জিকা" নামে কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা ফুলচন্দ্র বড়ুয়া ও দার্শনিক রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২), বুদ্ধের জীবনভিত্তিক 'জগজ্জ্যোতি' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০-১৯০৮), "হস্তসার' নামে বাঙ্গালি বৌদ্ধদের নিত্যপাঠ্য বইয়ের লেখক পালি ভাষা ও সাহিত্যে অসামান্য পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪) এবং পালি গ্রন্থের রচয়িতা নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬-৯৬)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় বই 'হস্তসার' থেকে 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকার' অধিকাংশ মন্ত্র সংগ্রহ করেছেন বলে কোলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সুধাংশু বিমল বড়ুয়া তাঁর রচিত "রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি" বইতে উল্লেখ করেছেন। সর্বানন্দের 'জগজ্জ্যোতি' কাব্যগ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কবি নবীন সেন তাঁকে বলেছিলেন, "সর্বানন্দ, তুমি 'জগজ্জ্যোতি' লিখবে জানলে আমি 'অমিতাভ' লিখতাম না"। ১৯৪৬ ইংরেজীতে চট্টগ্রামের রাউজান থানার আবুরখীল গ্রামে এক স্মৃতিসভায় তিনি ভাষণ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন কিন্তু পরে কর্মসূচীর পবিবর্তনে চট্টগ্রাম শহরে আয়োজিত এক সভায় লিখিত ভাষণ উপস্থাপিত করেছেন। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল চট্টগ্রামের নিভৃত পল্লীতে যাঁরা বৃহত্তর সাহিত্য-অঙ্গনের অগোচরে সাধনা ও সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মান শিখাকে পরম মমতায় সঞ্জীবিত রেখেছেন, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁদের সাহিত্যসাধনাকে এ নিবন্ধে যথাযথ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে রয়েছে ঃ বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজ, বৌদ্ধ দর্শনের ঐতিহাসিক তথ্য, প্রতীচ্যে বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও পুনর্জ্জন্ম, শাক্য লিচ্ছবি ও বৃজি বংশের ধ্বংস কাহিনী, আদি বৌদ্ধধর্ম, ভেল সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব, গোজেন লামা, গুপ্ত যুগে ত্রিপুরায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতি, প্রার্থনা ও উপাসনা, মহাস্থবির কালিকুমার ও ডাক্তার কমলচন্দ্র বড়ুয়া। তাছাড়া ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তাঁর বিভিন্ন লিখিত ভাষণ একদিকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি সহমর্মিতায় দীপ্ত অন্যদিকে রচনাশৈলীতে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন।

১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ রাউজান থানার হোয়ারাপাড়া গ্রামের ভগীরথনগরে অগ্‌গসার জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মহাসভার সমাজ শাখার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বৌদ্ধসমাজের সমকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এই ভাষণে সমকালীন সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণ করে উপসংহারে তিনি বলেছেন ঃ

'বড়ই খেদ ও অনুতাপের বিষয় এই যে আধুনিক নবীন ভিক্ষুদিগের মধ্যে কাহারো মনে বাংলার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে একতাবদ্ধ করিবার কল্পনা এখনো জাগে নাই। যাঁহারা একই শাস্ত্র মানিয়া চলেন, একই শিক্ষা ও দীক্ষা স্বীকার করেন তাহাদের নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার সার্থকতা কি? যদি দেখিতে পাইতাম প্রত্যেক সম্প্রদায় এক এক নুতন ধর্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, নতুন আদর্শ গঠন করিয়াছেন, নূতন কর্মউদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে সম্প্রদায়ভেদের অর্থ উপলব্ধি করিতাম। জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভেদের মধ্যে এইরূপ সার্থকতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভেদের মধ্যে তাহা নাই। আমি এইরূপ কল্পনা নিশ্চয় করিনা যে, বলা মাত্রই ভিক্ষুগণ তাঁহাদের ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া একতাবদ্ধ হইবেন। এই অবস্থায় আমি মনে করি সংঘরাজ, তিতন, দাসু, রামধন দলে বিভক্ত ভিক্ষুগণ যে যেভাবে আছেন সম্প্রতি সেভাবে থাকুন এবং সঙ্গে সঙ্গে দলনিরপেক্ষ একটি শাক্যসংঘ গঠিত হউক।'

ষাট বছরের বেশি আগে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার সমাজচিন্তা ও মননশীল বক্তব্য সমকালীনতার সীমা অতিক্রম করে আজকেও বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাঁর সমাজচিন্তা 'বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ' শীর্ষক ৬০ বছর আগে "জগজ্জ্যোতি" পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। বৌদ্ধ সমাজে ঐক্যপ্রক্রিয়ায় 'বহুত্বের মধ্যে ঐক্য' ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজ ঐক্য ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেনঃ

"দু'চারজন নামজাদা বড়লোকের দোহাই দিয়ে কোন সমাজকে উন্নতিশীল বা অবনতিশীল বলা যায় না। দু'চারিজন শেক্সপীয়ার ও মিল্টন, ক্রম্‌বেল ও নেলসন, পীট ও গ্লেডষ্টোন প্রভৃতি দোহাই দিয়া ব্রিটিশ-জাতি বলিতে পারে না, আমরা উন্নতশীল। দুচারজন অশ্বঘোষ ও কালিদাস, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক, বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের দোহাই দিয়া ভারতীয় আর্যজাতি বলিতে পারেনা, আমরা উন্নতশীল। তেমনি দুচারিজন কৃষ্ণনাজির ও চন্দ্রমোহন, লালমোহন ও কৃপাশরণ, কালিন্দী ও ভুবনমোহন, কুঞ্জধামাই ও নিপুচাঁই, চাইলাপ্রু ও মং খেজারীর দোহাই দিয়া বলিতে পারিনা আমরা উন্নতশীল। ইহাদের বাইরে আরো হাজার ভ্রাতা ভগ্নী পড়িয়া আছে যাহাদের দ্বারা প্রধানতঃ সমাজদেহ গঠিত, যাহাদের মঙ্গলামঙ্গল ও উন্নতি অবনতির উপর সমগ্র সমাজের ভাগ্যলিপি অনেকাংশে নির্ভর করে। সমাজের অবস্থা ও গতি নিরাকরণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে, ইহারা কোন অবস্থায় আছে, কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে এবং ইহাদের লক্ষ্যস্থলও বা কি?"

এসব উদ্ধৃতি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধের বক্তব্যে বঙ্গীয় বৌদ্ধদের সমকালীন সমাজ-সংগঠন, ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা, ভিক্ষুদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠা, জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও নবচেতনার, প্রসার বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বেণীমাধব নিজের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কর্মধারায় যে অবদান রেখেছেন, তাতে সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি একাধারে সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীতে তাঁর জীবৎকালে অনগ্রসর বৌদ্ধদের কর্মধারায় যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম জীবনে অধ্যাপনাকাল থেকে তিনি বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং পরবর্তীতে কোলকাতা ধর্মাঙ্কুর বিহারের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ধর্মাঙ্কুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা কর্মযোগী কৃপাশরণের মহাপ্রয়াণের পর জরুরী কারণে বিহারের নিজস্ব জমি বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করা হয়। ১৯৩০-৩৩ সময়কালে বিহারের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু অষ্টম সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথের তাঁর স্মৃতিচারণে 'জগজ্জ্যোতিতে' লিখেছেন যে, দীর্ঘদিন ঋণ অনাদায় হেতু জমি আইনগত বিধিবিধানে নিলামে যাওয়ার উপক্রম হয়। ড. বেণীমাধব এই সঙ্কটমুক্তির জন্য তাঁর পরম হিতৈষী বিশিষ্ট শিল্পপতি যুগল কিশোর বিড়লাকে অনুরোধ জানালে বিড়লা বিরাট অঙ্কের ঋণ পরিশোধ করে দেন এবং সেই দায়মুক্ত ভূমির উপর 'আর্য বিহার' নামে দ্বিতল ভিক্ষুনিবাস তাঁর অর্থানুকূল্যে নির্মাণ করা হয়। (জগজ্জ্যোতি, বেণীমাধব জন্মশতবার্ষিকী স্বারক সংখ্যা, ১৯৮৯)। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে চর্চার জন্য তিনি কোলকাতায় নালন্দা বিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু পূর্ণানন্দ স্বামীর সাথে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'জগজ্জ্যোতির' সম্পাদনা করেছেন। তাছাড়া তিনি *Indian Culture and Buddhist India* নামে দুটো পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি মহাবোধি সোসাইটি, ভারতীয় ইরাণ সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভারতীয় মহাবিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সংস্থার সদস্য ছিলেন। তিনি চারবার ১৯২৪, ১৯২৭, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে বার্মা সফর করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির উপর সারগর্ভ ভাষণ দেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর মৃত্যুর এক মাসাধিক আগে এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে বি. সি. লাহা স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন।

জীবনের শেষ দিকে তিনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত কল্যাণের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উষালগ্নে দেশব্যাপী ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলনের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এসবের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের অবস্থান বিষয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে দিনবদলের ঐতিহাসিক লগ্নে ভারত ও পাকিস্তান এ দুটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সময়ে তিনি চট্টগ্রামের প্রত্যন্তে বসবাসকারী বৌদ্ধদের ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৪৬ সালে তিনি শেষ বারের মতো চট্টগ্রামে এসেছিলেন। তখন তিনি তিনজন বৌদ্ধ মনীষীর স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশে "বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধদের শতবর্ষের অবদান" শীর্ষক ভাষণটি পাঠ করেছিলেন। এ ভাষণে তিনি শতবর্ষব্যাপী চট্টগ্রামের নিভৃতে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সাহিত্য, কাব্য ও দর্শনচর্চার ইতিবৃত্ত যথাযথ প্রেক্ষিতে তুলে ধরেন। তিনি রাউজান থানার হোয়ারাপাড়া গ্রামের সুদর্শন বিহারে আয়োজিত প্রথিতযশা ভিক্ষু সৌগতসূর্য সংঘনায়ক অগ্‌গসার মহাস্থবিরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে অগ্নিযুগের

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন ও কবি নবীন সেনের স্মৃতিধন্য জন্মস্থান নোয়াপাড়া গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দেন।

তিনি নিজের সম্প্রদায় বৌদ্ধদের বিভিন্ন কর্মধারায় যে অবদান রেখেছেন, তাতে সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হয়েছে। জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী বেণীমাধবের জীবনে অসাধারণ মনীষার সাথে চরিত্রের সরলতা, নিরহঙ্কার আচরণ ও সকলের প্রতি সংবেদনশীল মনোভাবের এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছিল। চিন্তাজগতে যিনি নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক মননের অধিকারী তিনি ব্যক্তিজীবনে সরল, গুণগ্রাহী, মানুষের ব্যথায় সমব্যথী ও সংবেদনশীল। তাঁর দর্শনচিন্তার মধ্যে এক মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন।

আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়ার অসামান্য পান্ডিত্য এবং ভারততত্ত্ব তথা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন চর্চার মূল্যায়ন করে তাঁর সমসাময়িকেরা করেছেন, ১৯৮৯ তে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বৎমন্ডলীর উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারে নতুন করে বেণীমাধব চর্চার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর জ্ঞানচর্চা, পান্ডিত্য এবং ভারততত্ত্ব তথা শিলালিপি চর্চায় অসামান্য অবদান সম্পর্কে মূল্যায়ন করে যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশ্বভারতীয় উপাচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী, আরেক প্রিয় ছাত্র ও পরে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ডঃ নলিনীনাথ দাসগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রফেসর ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট- গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের প্রাক্তন সচিব অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী ও ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী। অঞ্জলী রায় 'ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব' থিসিস রচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

১৯৮৯ সালের ২৮-২৯ নভেম্বর কোলকাতায় জন্ম শতবার্ষিকীর আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানমালার পর সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ', কোলকাতা মন্তব্য করেছে ঃ "গ্রন্থকীট আর গ্রন্থবিদ উভয়েরই বাস গ্রন্থের দুই মলাটের দুরূহ অন্তরালে, লোকচক্ষু স্বভাবতই সেখানে পৌছায় না। পুরাতন গ্রন্থ দুজনেরই রস এবং রসদ হয়ে ওঠে আলোছায়াময় অক্ষরের রহস্যময় জগতে উভয়েরই বিচরণের পৃথিবী, তবু কত তফাৎ, মেরুপ্রমাণ বৈসাদৃশ্য। একজন অন্ধ, অন্যজন অতীন্দ্রিয় চক্ষুষ্মান। এই জীবনে পারিপার্শ্বিকের সাথে জ্ঞানজগতের মর্মসূত্রটি আবিষ্কার করেন, পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবিত করেন এবং পরিণামে উত্তরপুরুষের কাছে অচিরেই বিস্মৃত হন। বেণীমাধব বড়ুয়া এমনই একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, গবেষক এবং বৌদ্ধ বাংলার স্থপতি - সেতুকার ছিলেন। সম্প্রতি যাদবপুর ইনস্টিটিউট অব কেমিকেল বায়োলজি ভবনে বেণীমাধবের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবসে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়ে গেল। সেখানেই ধরা পড়ল, তাঁর নিজের মানুষ, আমরা কত সহজে ভুলে গেছি। বস্তুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পর বেণীমাধব বড়ুয়া বাঙালীর কাছে আর একটি স্মরণীয় নাম। .... বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত বেণীমাধব বড়ুয়া বাল্যকাল থেকেই এই ধর্মশাস্ত্র ও কাহিনীর প্রতি কৌতূহলী ছিলেন। সে সময়ে ব্রহ্মদেশ থেকে আগত এক প্রবীণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আগমন তাঁকে এ ব্যাপারে আরও উদ্দীপ্ত করেছিল। এই গূঢ় ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ভেতর প্রবেশ করতে গিয়ে তাঁকে ভাঙতে হয়েছিল পালি প্রাকৃত সংস্কৃতের দুরূহ বাধা, কিছু তিব্বতী ও চীনা ভাষার প্রাচীরও তাঁকে ডিঙোতে হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত চট্টগ্রাম তাঁর বিদ্যাদর্শনের চড়াই পথটির পূর্বভূমি হিসেবে কাজ করেছিল। বিভিন্ন ভাষার দর্শন

ও ইতিহাসে বেণীমাধবের মেধাবী পাণ্ডিত্য ছিল অসামান্য। প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যায় তিনি অসামান্য নৈপুন্য দেখিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান ও 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধিতে সম্মানিত হন। ... জীবনের শেষ পর্বে বিপুল বৌদ্ধ শাস্ত্রকে বিন্যস্ত করে বঙ্গানুবাদে হাত দিয়েছিলেন, তার প্রথম খন্ডটি কেবল প্রকাশিত হয়েছিল বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ নাম দিয়ে। এ ছাড়া ত্রিপিটকের 'মধ্যমনিকায়' এর অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলী মুদ্রণের পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং তাঁর নামে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির কথাও শোনা যাচ্ছে।"

ষাট বছরব্যাপী জীবনের পরিসরে যিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাচীন সংস্কৃত, পালি ভাষায় গবেষণা করেছেন, দুরূহ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী ভাষায় আকীর্ণ শিলালিপির আলোছায়াময় জগতে বিচরণ করেছেন এবং দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ও শাস্ত্রচর্চা করেছেন, তাঁকে জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন একজন ধ্যানী পুরুষ বলে অভিহিত করা চলে। নিরন্তর অন্বেষার মধ্যে সত্যকে যথাযথ প্রেক্ষিতে আবিষ্কার করাই তো তাঁর মৌলিক জীবনাদর্শ। তিনি সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াসে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন।

জ্ঞানরাশির বিপুল সমুদ্রে দুরন্ত হাওয়ার মতো তিনি তাঁর তরী বেয়ে চলেছিলেন। কিন্তু মাত্র ষাট বছর বয়সে মৃত্যু এসে সে চলাকে চিরকালের মতো থামিয়ে দিল। নিরপেক্ষ সংস্কারমুক্ত চেতনায় তিনি সকল তত্ত্ব ও তথ্যকে বিচার করে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহে পৌছেছিলেন। অনেক সময় প্রখ্যাত পণ্ডিতদের ভ্রান্তিজনক সিদ্ধান্তকে তথ্য, যুক্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করেছেন; আবার পূর্বসূরী ও সমসাময়িকদের মতামতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। অন্যের মনীষাকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন, তিনি কোন রকম একদেশদর্শিতা ও গোঁড়ামি গ্রহণ করেননি, বরং সকল দার্শনিক মতবাদ ও ধর্মীয় শাস্ত্রকে ইতিহাসের বিবর্তনের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। জীবন দৃষ্টিতে নিরপেক্ষতা এবং দর্শন বিচারে সত্যানুসন্ধিৎসা তাঁর জীবনদর্শনকে মহিমান্বিত করেছে।

প্রাগ -বৌদ্ধ যুগের এক হাজার বছরে ভারতীয় দর্শনের মূল্যায়নে আচার্য বেণীমাধবের মনীষা ও সংস্কারমুক্ত দর্শন আলোচনার স্বরূপ প্রতিভাত হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশাল পাণ্ডিত্য ও নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েও তিনি যে শ্রদ্ধা ও বিচারের সাথে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, জৈনধর্ম ও আজীবকদের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহকে মূল্যায়ন করেছেন, সেগুলোর মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর নিরপেক্ষ মূল্যায়ন পাঠককে প্রবলভাবে চিন্তা করতে প্রেরণা দেয়। শিলালিপি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও ইতিহাস বিচারে তাঁর গভীর অনুশীলন এবং তুলনামূলক মূল্যায়নে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাঁর সীমাহীন গভীরতা ও মনীষা পণ্ডিতজনদের বিমুগ্ধ করেছে। তাঁর জীবনাদর্শ স্বভাবতই এমন একজন পণ্ডিতের যিনি একাধারে জ্ঞানী ও ধ্যানী এবং দার্শনিক ও সাহিত্যিক। জ্ঞানের প্রতি এই সামগ্রিক নিমগ্নতা তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ডঃ নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে তাঁর জীবনাদর্শের ছবি এঁকেছেন এভাবেঃ *"বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সিঁড়ির মুখে দোতালার সেই ঘরখানি। সেখানে বসিয়া তিনি রাজা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চেয়ে বেশী গৌরবের কোনও পদ আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সেই রাজ্যে ঢুকিয়া রাজ্যেশ্বর বসিয়া বসিয়া দান করিতেন যে দানের ক্ষয় নাই, যে দান শুধু অভিবৃদ্ধির পথে লাফাইয়া চলে। তাঁহার কণ্ঠের ভাণ্ডার হইতে, আর তাঁহার অনলস লেখনী-মুখের নির্ঝর হইতে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি ও শিল্পের ইতিহাস কত না দান গ্রহণ করিয়াছে এবং সমৃদ্ধ হইয়াছে (জগজ্জ্যোতি, কলিকাতা, ১৩৫৯ বাংলা)।"*

পাণ্ডিত্যের সাথে চরিত্রের সরলতা এবং সকলের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর ব্যক্তিচরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। তিনি ছাত্রদের জ্ঞানপিপাসা তীব্রতর করেছেন এবং তাঁদের যোগ্যতাকে সানন্দে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নির্লোভ ও নিরহঙ্কার ডঃ বড়ুয়া নানা ধরনের লোকের সমস্যায় সমব্যথী ছিলেন।

জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী আচার্য বেণীমাধব মানুষ হিসেবে অনন্যসাধারণ, বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত হলেও তাঁর মত সরল, অনাড়ম্বর, সমদর্শী ও ছাত্রবৎসল পরোপকারী মানুষ দুর্লভ। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে কোলকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী (ব্যক্তিগত সম্পর্কে ড. বেণীমাধবের ভাগিনেয়) লিখেছেন : "বাল্যকাল থেকে আত্মভোলা পোশাক পরিচ্ছদে উদাসীন অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী ড. বড়ুয়া পরিণত বয়সে হয়েছেন দুরূহ তাত্ত্বিক, সমস্যা সমাধানে চিন্তামগ্ন দার্শনিক। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত আত্মসমাহিত ঋষি। শুনেছি, তিনি কোনদিন খেতে বসে আলোচনা বা চিন্তা করতে করতে গভীর রাত, এমনকি ভোরবেলা পর্যন্ত কাটিয়ে দিতেন। তাঁর খেয়াল থাকত না যে ভাতের থালা তাঁর সামনে পড়ে আছে" (জগজ্জ্যোতি কোলকাতা ১৯৮৯)।

একুশের ভাষা শহীদদের স্মরণে ঢাকার বাংলা একাডেমি ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জীবনী গ্রন্থমালা সিরিজে বেণীমাধব বড়ুয়ার জীবনী প্রকাশ করেছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা 'প্রসঙ্গ-কথা'য় বাংলা একাডেমির তদানিন্তন মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ লিখেছেন ঃ

'যে সকল বরেণ্য ব্যক্তিত্বের সৃজনশীল কর্ম ও সাধনার মৌলিকতায় বিশ শতকের বাঙালি চিন্তা ও মনন বিশিষ্টতা অর্জন করে অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। তিনি একাধারে শিক্ষক, গবেষক, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রাচীন ভারতীয় বহু অনাবিষ্কৃত শিলালিপি উদ্‌ঘাটনের পথিকৃৎ এবং সুলেখক, সমাজ হিতৈষী ও সমাজসংস্কারক। পালি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁর রচিত *'A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, Asoka Edicts in New Light, Ceylon Lectures, Studies in Buddhism* ইত্যাদি গ্রন্থগুলো জ্ঞানের সাগরস্বরূপ। দেবপ্রিয় বড়ুয়া তাঁর এই গ্রন্থে এই মনীষির ঘটনাবহুল জীবন-কথা বিবৃত করেছেন।"

অধ্যাপনা, গবেষণা ও গ্রন্থনার ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পারিপার্শ্বিক সমাজ ও নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি দায়বদ্ধতাকে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষভাগে সিংহলে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি তাঁর ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার আলোচনা প্রসংগে বাংলা তথা চট্টগ্রামের নিভৃত এক প্রান্তে তাঁর স্বধর্মবাদীদের ধর্মের ক্ষীণ শিক্ষা প্রজ্জলিত রাখার জন্য সংগ্রামের করুণ কাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। একদিকে তিনি যেমন প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সমকালীন মিথ্যাচার ও লৌকিক আচরণকে সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে সমাজের নানাবিধ সংস্কার ও সমস্যা সম্পর্কে মুক্তদৃষ্টিতে তাঁর ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন।

আচার্য বেণীমাধবের চরিত্রে মানবতাবোধ ও সকলের প্রতি হৃদয়বেত্তার দিক প্রকাশিত হয়েছে। ঘনিষ্ট সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা থেকে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ ধর্মের দিক হইতে অধ্যাপক বড়ুয়া বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সাধনায় তিনি কতটা কি উন্নতি করিয়াছিলেন, না করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই- তাহা জানিবার অধিকারও আমার নাই। কিন্তু তাঁহার ভিতরে কতগুলি বৌদ্ধগুণ দেখিয়াছি তাহা ছিল যেন তাঁহার চিত্তে বা চরিত্রে সিদ্ধবস্তু, কোন সাধ্যবস্তু নয়। বৌদ্ধধর্মকে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে তাঁহার একটি মূল সত্য আমার মনে হইয়াছে বৈরীত্যাগ ও বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। অধ্যাপক বড়ুয়ার দুনিয়ায় কোনও বৈরী ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। এই অজাতশত্রুত্ব তাঁহার চরিত্রের একটি সহজাত ধর্ম ছিল। অল্প কারণে তাঁহাকে সহসা অনেক সময় দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছি, কিন্তু মুহূর্তের এই জ্বলিয়া উঠা যেন

পরমুহূর্তেই আরও জল হইয়া গলিয়া যাবার জন্য। করুণা ও মৈত্রীকে তিনি শুধু মাত্র শাস্ত্রগত রাখেন নাই। এই উভয় ছিল তাঁর জীবনগত। এই করুণার মূল্য তাঁহাকে জীবনের অনেক কঠোর দারিদ্র্য, অনেক বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া দিতে হইতেছে; কিন্তু তথাপি তিনি এ পথ হইতে ফিরিবার চেষ্টা করিয়াও ফিরিতে পারেন নাই-তাঁহার সহজ ধর্ম তাঁহাকে তাঁহার বুদ্ধির ধর্ম হইতে সর্বদাই প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছে।' (জগজ্জ্যোতি, কলিকাতা,১৩৫৯ বাংলা)

আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়ার গ্রন্থাবলী গভীর দার্শনিক তত্ত্বমূলক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও তাঁর গদ্যরচনা স্বচ্ছন্দ ও সাহিত্যগুণে মণ্ডিত। তাঁর ধর্ম দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবল স্রোতের মত বেগবান গদ্যরচনা মনোযোগী পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁর ইংরেজী রচনাশৈলী স্বতঃস্ফূর্ত ও সাহিত্যধর্মী। বক্তব্যের গভীরতা ও ভাবের বিস্তারকে প্রকাশ করার সময় তিনি যখন দীর্ঘ বাক্যাবলী ব্যবহার করেছেন তখন যুক্তির বিন্যাসে ভাষার সংহত প্রবাহ অনেকটা ক্লাসিক ধর্মী রূপ ধারণ করেছে। শৈলীর স্বচ্ছন্দতার কারণে কঠিন বক্তব্যও অর্থময় ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলেঃ প্রাগ-বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্পর্কিত ইংরেজী গ্রন্থের উপসংহার অধ্যায়টি যেমন ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্তের বর্ণনায় পরিশ্রুত জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসারে তেমনি ইংরেজি ভাষায় তাঁর বর্ণনা সরস, প্রাঞ্জল ও কাব্যধর্মী। জ্ঞান আত্মস্থ হলে ভাষা স্বতস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আচার্য বড়ুয়ার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের রচনাতে এ সাহিত্যবৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর স্পষ্ট। তাঁর রচনার তথ্যবহুলতা পাঠককে পীড়িত করে না। ইংরেজীতে *Gaya and Buddha Gaya* গ্রন্থে তিনি ইতিহাস ও কিংবদন্তীর ব্যাখ্যানে এমন সহজ ভঙ্গীতে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন যে কোন কোন সময় মনে হয়েছে, যেন একটি কাহিনীর আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অবয়ব ক্রমশ স্ফুরিত হচ্ছে। অপূর্ব গদ্যের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় তথ্য ও তত্ত্বের কৌশলী সমাবেশে গয়া ও বুদ্ধগয়ার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চিত্রণে তিনি বিভ্রান্তির প্রথাসিদ্ধ কাহিনীকে খন্ডন করে যথার্থ প্রতিভাসে ইতিহাস-আশ্রিত সত্যকে বিন্যাস করেছেন। সিংহলে প্রদত্ত আটটি লিখিত বক্তৃতায় পরিণত বয়সের পরিশ্রুত জ্ঞানসম্ভারের যৌক্তিক আলোচনায়, ভাষার গাম্ভীর্য ও রচনার সুসংবদ্ধ দার্শনিক বিন্যাসকে অসাধারণ বলা চলে। এখানে শ্রীলঙ্কার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আলোচনায় এবং বুদ্ধের মতবাদকে তুলনাগত দর্শনের প্রেক্ষিতে উপস্থাপনায় তাঁর ইংরেজী ভাষা ক্লাসিক ধর্মী।

তাঁর মোট গ্রন্থের ও রচনাবলীর বেশির ভাগ ইংরেজিতে হলেও তিনি বাংলা ভাষায় কয়েকটা গ্রন্থ ও কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানেও তাঁর রচনা সরস ও প্রাঞ্জল। বাংলায় রচিত দার্শনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী দার্শনিক পরিভাষায় মণ্ডিত হলেও পাঠক অভিনিবেশ সহকারে সেগুলো পাঠ করে তাঁর চিন্তা ও বিশ্লেষণের ধারার সাথে পরিচিত হতে পারেন। সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত তাঁর রচনাবলীর ভাষা যুক্তিধর্মী ও বিশ্লেষণের কাঠামোতে রচিত। "বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান" বা "বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতির " প্রায় ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাতে তাঁর গদ্য রচনা স্বচ্ছন্দ, বেগবান ও যুক্তিধর্মী।

চট্টগ্রামের নিভৃতে বৌদ্ধ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে ১৮৮৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর যে শিশুর জন্ম হয়, তিনি কালক্রমে অসামান্য প্রতিভাবলে দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, প্রাচীন দুরূহ লিপির আবিষ্কারক, বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ ও ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৪৮ সালে ২৩ মার্চ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ীতে ফেরার পর মধ্যরাত্রে তিনি জীবন থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে গেলেন। মৃত্যুর প্রায় ৪৪ বছর পর সমকালীন সময়ে তিনি জ্ঞানের জগতে বিদ্বৎসমাজে ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুরাগী ব্যক্তিদের কাছে কালজয়ী হয়ে রয়েছেন।

বৌদ্ধসমাজ বিনির্মাণে আইনজীবী ফণীভূষণ বড়ুয়া

বিগত শতবর্ষের পরিক্রমায় বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যে সব মেধাবী ব্যক্তিত্ব সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত আইনজীবী ফণীভূষণ বড়ুয়ার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। তিনি ১৮৮৯ সালে চট্টগ্রাম জিলার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সতীশচন্দ্র বড়ুয়া উনবিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং মোক্তারী পাস করে আইন ব্যবসায়ে প্রভূত খ্যাতি ও বিত্ত অর্জন করেন। মাতা সুনীতিবালা বড়ুয়ার বাপের বাড়ী রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে। তাঁদের মধ্যম ছেলে ফণীভুষণ চট্টগ্রাম শহরের কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ধাপে ধাপে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ও বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। ব্রিটিশ রাজত্বের সে সব দিনে তিনি আকর্ষণীয় সরকারী চাকুরির প্রতি আকৃষ্ট হননি, বরং পিতার আদর্শে আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়ে সক্রিয় সমাজকর্মে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। আইনজীবী, সমাজকর্মী ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ফণীভূষণ বড়ুয়া পাকিস্তান গণপরিষদের নাগরিক অধিকার কমিটির সদস্য হিসেবে একটি কর্মবহুল জীবন অতিক্রম করে ১৯৬০ সালের ২ জুলাই চট্টগ্রাম শহরে পরলোকগমন করেন। জীবনের অর্ধশতাব্দীব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয় কর্মধারায় তিনি ব্রিটিশ ভারতে ও পাকিস্তানে পশ্চাৎপদ সংগ্রামশীল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিকাশে ও উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখেন।

তাঁর পিতা মোক্তার সতীশচন্দ্র বড়ুয়া প্রখ্যাত সমাজকর্মী ছিলেন এবং বৌদ্ধদের আদি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটিতে দীর্ঘকাল অন্যতম সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সমিতির মুখপত্র বৌদ্ধ সমাজের প্রথম যুগের পত্রিকা 'বৌদ্ধ বন্ধুর' প্রকাশক হিসেবে তিনি অনগ্রসর বৌদ্ধদের জাগৃতিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতাক্রমে যামিনীভূষণ বড়ুয়া, ফণীভূষণ বড়ুয়া ও ইন্দুভূষণ বড়ুয়া। যামিনীবাবু ব্রিটিশ আমলে সরকারের কৃষি ও সমবায় বিভাগে চাকুরী করেছেন। মধ্যম স্বাধীনচেতা ফণীভূষণ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন এবং কনিষ্ঠ ভাই ইন্দুভূষণ বড়ুয়া বি. এস. সি. বি. টি. এবং ক্যামব্রিজ থেকে টি. ডিপ *(Teachers' Diploma)* উপাধি অর্জন করে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত জিলা স্কুলে শিক্ষকতায় সারাজীবন নিয়োজিত থেকে কুমিল্লা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁদের দুই বোন হলেন ঃ প্রমোদাবালা মুৎসুদ্দী ও যোগমায়া বড়ুয়া। প্রমোদাবালার বিয়ে হয় খ্যাতনামা সমাজনেতা হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দীর পরিবারে। যোগমায়ার স্বামী রাঙ্গুনীয়ার ঘাটচেক গ্রামের কামিনী মোহন বড়ুয়া, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ .বাহিনীতে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামের দেড় শতাধিক বছর প্রাচীন মহানন্দ বিহারে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির "পাহাড়তলী গ্রামের অতীত ঐতিহ্য" শীর্ষক এক নিবন্ধে (সাময়িকী প্রজ্ঞা, ১৯৮৯ সালে বিনয়াচার্য জিনবংশ মহাস্থবিরের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণিকা) উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে এই গ্রামের ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের একটি অপরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন। ফণীভূষণ বড়ুয়া যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, ধর্মাধার মহাস্থবিরের মতে সেটা গ্রামের প্রাচীনতম বংশ ফুলতংজার গোষ্ঠী। এই একই বংশেই প্রতিভাবান ভারততত্ত্ববিদ বেণীমাধব বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে বৌদ্ধ সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট এবং ১৯১৩ সালে প্রথম এম এ ডিগ্রি অধিকারীদের

অন্যতম মহিমারঞ্জন বড়ুয়া এই বংশের সন্তান এবং ফণীবাবুর আপন জ্যেষ্ঠতুত ভাই। মহিমাবাবুর সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপূর্বরঞ্জন বড়ুয়া বি এ পাস করে ব্রিটিশ সরকারের আমলে অবিভক্ত বাংলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বৌদ্ধদের মধ্যে এম এ ডিগ্রি প্রাপ্ত প্রথম তিনজনের অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রেবতীরমন বড়ুয়া এবং তাঁর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ড. অরবিন্দ বড়ুয়া এম এ পি এইচ ডি (লন্ডন) বার-এট-ল (লণ্ডন) এই বংশের সন্তান। ড. অরবিন্দ বড়ুয়া অবিভক্ত বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কর্মধারায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ফণীবাবুর নিজস্ব পারিবারিক ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। বৌদ্ধদের মধ্যে অগ্রণী এই প্রাচীন পরিবারের প্রেক্ষাপটে ফণীবাবুর মানস গঠিত হয়। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির লিখেছেন ঃ ফুলতংজা গোষ্ঠীর লোকেরা-নানা সময় নানা উপাধি যেমন বড়ুয়া, তালুকদার, মুৎসুদ্দী, চৌধুরী উপাধি ধারণ করতেন। ফণীবাবুর পিতামহ অনঙ্গমোহন মুৎসুদ্দীর চার পুত্র। তাঁরা হলেনঃ কমলচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, মনমোহন ও সর্বানন্দ। আজ থেকে ৮৮ বছর আগে (জগজ্জ্যোতি ১৬ সংখ্যা, ১৩২০ সাল) তরুণ প্রতিভাবান বেণীমাধব বড়ুয়া কোলকাতা "জগজ্জ্যোতি" পত্রিকায় "ডাক্তার কমলচন্দ্র বড়ুয়া" শীর্ষক নিবন্ধে তাঁর জীবনকথার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। কমলচন্দ্র ও তাঁর ভাইয়েরা 'মুৎসুদ্দী' উপাধির বদলে বৌদ্ধদের পরিচয় জ্ঞাপক 'বড়ুয়া' পদবী গ্রহণ করেছেন। ফণীবাবুর জেঠা (বাবার আপন বড় ভাই) কমলচন্দ্র বড়ুয়ার জীবনকথা বর্ণনায় বেণীমাধব বড়ুয়া লিখেছেন ঃ

"১২৭৪ শকের ১৮ অগ্রহায়ণ শুক্রবার পাহাড়তলী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ফুল তংজা বংশীয় এক দীন পরিবারে কমলচন্দ্র বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতা অনঙ্গমোহন মুৎসুদ্দী লোকান্তরিত হন। জননীর কৃপায় তিনি তৎকালীন সামাজিক প্রথানুমতে প্রবজ্যা অবলম্বন করত কতিপয় বৎসর স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বৌদ্ধশাস্ত্রাদি শিক্ষা করেন। পরে পুনরায় জননীর আদেশক্রমে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জননীর কষ্ট ও ভ্রাতা ভগ্নিদের দুঃখ বিমোচনকল্পে বদ্ধপরিকর হন। তিনি সংসারে পুনরাগমন করিয়া অকূল চিন্তাসাগরে ভাসমান হইলেন। মনে হইতে লাগিল যেন প্রব্রজ্যার উন্মুক্ত আকাশ পরিত্যাগ করিয়া বনের পাখী খাঁচায় বদ্ধ হইয়াছেন। যাহা হউক, দীর্ঘ চিন্তার পর কমলচন্দ্র আরাকান যাইবেন স্থির করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং তথায় চিকিৎসা ব্যবসায় বিস্তর ধনাগম করিয়া মাসে মাসে মাতাকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা মনোমোহনও ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ সতীশ ও সর্বানন্দকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাহাড়তলী মডেল স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা যথাসময়ে মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সতীশচন্দ্র মোক্তারীর পরীক্ষা ও সর্বানন্দ কম্পাউন্ডারী পাশ করিলেন। অভাব দূরে গেল, জননীর জীবন ধন্য হইল। সংসারে পুনরাগমন করিয়া কমলচন্দ্র বড়ুয়া ঢাকাখালী গ্রামের শ্রীমতী দ্রুপদকুমারী নাম্নী জনৈক সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা সুকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দীর পুত্রবধু অন্নদাসুন্দরী, চট্টগ্রাম কলেজের পালি অধ্যাপক ও বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন বড়ুয়া এম এ, নীরোদা সুন্দরী, শিবপুর দুর্ঘটনায় নিমজ্জমান ব্যক্তিদের প্রাণরক্ষার্থে গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদানকারী শ্রীযুক্ত অপূর্ব বড়ুয়া বি এ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এতদ্দেশীয় প্রথম বৌদ্ধ ছাত্র শ্রীমান অনাদিরঞ্জন প্রভৃতি পুত্র-কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করেন। পাঠক বলুন দেখি, মহিমারঞ্জন, অপূর্বরঞ্জন প্রভৃতি যাঁহার সন্তান, সতীশচন্দ্র বড়ুয়ার ন্যায় অসীম গুণশালী যাঁহার ভ্রাতা তাঁহার মানব জন্ম কি সার্থক নহে?

এই ত গেল সংক্ষেপে তাঁহার গার্হস্থ্যের কথা। এখন একবার তাঁহার বাণপ্রস্থের কথা আলোচনা করা যাউক। যে বৎসর বাবু মহিমারঞ্জন বড়ুয়া বি এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন, সেই

বৎসর তিনি চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উপনীত হইলেন। তথায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুরে কিয়দ্দিন অবস্থান করত রামুর সুপ্রসিদ্ধ ধনী সদাশয় মং খেজারীর রোগের চিকিৎসা করিতে থাকেন। মং খেজারী অল্পদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি পারিতোষিক লাভের জন্য চিকিৎসা করি নাই। তবে যদি কিছু আমার উপকার করিতে আপনার বাসনা হইয়া থাকে, যাহাতে আমি শ্রীশ্রী কুশীনগরে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ যাপন করিতে পারি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সেই উপায় করিয়া দেন।

মং খেজারী আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রী কুশীনগরে প্রেরণ করেন। সংসারের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ডাক্তার কমলচন্দ্র সন্নাসী সাজিলেন। ইতঃমধ্যে তিনি দুইবার দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল কুশীনগরে ভগবান শাক্যসিংহের মহাপরিনির্বাণ লাভের স্থানেই তিনি মানবলীলা সাঙ্গ করিবেন।

*মংখেজারী ও বড় ছেলে মহিমারঞ্জন তাঁর জন্য যে টাকা পাঠাতেন, তিনি সেটা দরিদ্রদের দান করতেন। সর্বশেষে তিনি ৭২ বছর বয়সে বয়োভারে জীর্ণ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সময় সমুপস্থিত হলে তিনি তাঁকে স্নান করিয়ে দেওয়ার জন্য মহাবীর মহাস্থবিরকে অনুরোধ করলেন। ভাস্তেকে বল্‌লেন, পরের দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে তিনি ত্রিরত্নকে জীবন দান করলেন। পরদিন তাঁকে স্নান করিয়ে দেওয়ার পর নতুন চীবর পরিয়ে দেওয়া হল। পরদিন সময় আসন্ন হলে শুভ চরণাবৃন্দ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক সন্ন্যাসী কমলচন্দ্র পুন্যেতেজবিভা লইয়া জন্মের মত অন্তর্হিত হইলেন।"*বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁকে "বৌদ্ধ সমাজগগণের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক" বলে অভিহিত করেছেন। এই পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে ফণীভূষণ বড়ুয়ার মানস লালিত হয়েছে। ডাক্তার কমলচন্দ্রের সহোদর ভাই মোক্তার সতীশচন্দ্র বড়ুয়া আইনজীবী ফণীভূষণ বড়ুয়ার পিতা। তেজস্বী ব্যক্তিত্ব মোক্তার সতীশচন্দ্র পেশার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না থেকে অনগ্রসর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণে নিজেকে সমাজসেবায় নিয়োজিত করলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত অতি ক্ষুদ্র পশ্চাৎপদ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী নানা কুসংস্কারের বেড়াজাল, ভ্রষ্ট আচার ও ধর্মে তান্ত্রিকতার প্রভাবে ক্লিষ্ট। এই 'পটভূমিকায় ১৮৮৭ সালে দুজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', হারবাং এর গুনমেজু মহাস্থবির ও সাতবাড়িয়ার কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী বা কৃষ্ণ নাজির "চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধদের এই আদি সংগঠন চট্টগ্রাম শহরে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ, শিক্ষার ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের সুযোগ সুবিধা, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পালি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাসহ নানা দাবী দাওয়া নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানায় এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস রাখে। মোক্তার সতীশচন্দ্র বড়ুয়া এই সমিতির কর্মধারায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মধারায় অসামান্য অবদান রাখেন। গুনমেজু মহাস্থবিরের মহাপ্রয়াণের পর সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু সংঘরাজ আচার্য পুণ্যাচার ধর্মাধারী মহাথের যখন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন মোক্তার সতীশচন্দ্র বড়ুয়া কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্যতম সহ-সভাপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের আদি মাসিক পত্রিকা 'বৌদ্ধ বন্ধু' প্রকাশিত হয়। বাঙালী বৌদ্ধদের সর্বপ্রথম প্রকাশিত পত্রিকা 'বৌদ্ধ বন্ধু' সম্পর্কে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন - "বাংলার নবজাগরণের আদিতে বৌদ্ধদের অবিসংবাদিত নেতা কৃষ্ণ নাজির (কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী) উহার জনক ও পরিচালক। নানা কারণে মাঝে মধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।" ড..বেণীমাধবের ভাষায় 'সর্বজনপ্রিয় সতীশচন্দ্র বড়ুয়া 'বৌদ্ধ বন্ধুকে' পুনরায় জাগরিত করেন। এই পত্রিকা

সতীশচন্দ্রের সম্পাদকত্বে ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী প্রচার করে আজ থেকে শতবর্ষ আগে ছোট বৌদ্ধসমাজকে পথনির্দেশ দিতে সক্ষম হয়। সমিতির সহ-সভাপতি মোক্তার সতীশচন্দ্র বড়ুয়া কিছুকাল "বৌদ্ধ বন্ধু" পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম এনায়েতবাজার বৌদ্ধবিহার থেকে প্রকাশিত ২৪৫০ বুদ্ধাব্দের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির কার্যকারকগণের প্রকাশিত তালিকা নিম্নরূপ : সভাপতি - শ্রীযুক্ত মহাথের পুণ্যাচার ধম্মাধারী, সহকারী সভাপতি - শ্রীযুক্ত ধর্মবংশ ভিক্ষু, শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দী ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বড়ুয়া, সম্পাদক-নগেন্দ্রলাল চৌধুরী, সহকারী সম্পাদক-শ্রী ঈশানচন্দ্র বড়ুয়া ও শ্রী উমাচরণ বড়ুয়া এবং কোষাধ্যক্ষ - শ্রী হরকিশোর চৌধুরী (ড. জিনবোধি ভিক্ষুর সৌজন্যে প্রাপ্ত 'বৌদ্ধ বন্ধু' থেকে)।

মোক্তার সতীশচন্দ্র বড়ুয়া সমিতির কর্মকাণ্ডে একনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার ফলে পুত্র ফণীভূষণ বড়ুয়া তাঁর থেকে সমাজকর্মের প্রেরণা আহরণ করেন। তেজস্বী আইনজীবী ফণীভূষণ বড়ুয়া পিতার আদর্শ অনুসরণ করে পশ্চাৎপদ বৌদ্ধদের অধিকার রক্ষার ব্রতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। জেঠা ডাক্তার কমলচন্দ্র বড়ুয়ার ত্যাগব্রতী জীবনের আদর্শ সংবেদনশীল যুবক ফণীভূষণের মানস-গঠনে অবদান রেখেছে। লালদীঘির পূর্ব পারে জেল রোডে পিতার নির্মিত একতলা বাড়িতে বসে তিনি আইনশাস্ত্রের পুস্তকাবলী নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করেন এবং তীক্ষ্ণ মেধা দিয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত আইনের জটিল ধারাসমূহের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। ওকালতি পেশায় প্রত্যুতপন্নমতিত্ব একটি বিশাল গুণ এবং সওয়াল জবাবে ও যুক্তি তর্কের জাল বিস্তারে সেটা অতি প্রয়োজনীয়। আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া বুদ্ধির ও মেধার সাথে প্রত্যুতপন্নমতিত্বের সমন্বয়ে বিচারালয়ে যুক্তির জাল বিস্তার করতে সক্ষম হতেন। তাঁর অন্য দুই ভাই সরকারি চাকুরীতে সফলতা লাভ করেছেন। বড় জ্যেঠতুত ভাই অধ্যাপক মহিমারঞ্জন বড়ুয়া (ডাক্তার কমলচন্দ্রের বড় ছেলে) চট্টগ্রাম কলেজে পালির অধ্যাপনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ১৯৪৩ কি ১৯৪৪ সালের দিকে ইংল্যাণ্ডে অবস্থানরত পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি চট্টগ্রাম থেকে অসীম ঝুঁকি নিয়ে লন্ডন যাত্রা করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের সাসেক্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং সেখানে পরলোকগমন করেন। পিতার স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য দেশের বৌদ্ধসমাজের সাথে আমরণ সংযোগ রক্ষা করেছেন এবং স্বগ্রামের মহানন্দ বিহারসহ নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করেছেন। ফণীবাবুর অন্য জেঠতুত ভাই অপূর্ব রঞ্জন বড়ুয়া ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকুরি করেছেন। অটুট পরিবারিক বন্ধনের প্রেক্ষাপটে আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া জীবনের সংগ্রামমুখর পথে নানা চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে সমাজকর্ম ও রাজনীতির চত্বরে সাহসের সাথে সফলভাবে অগ্রসর হতে পেরেছেন।

যৌবনে সংসার জীবনে প্রবেশকালে ফণীভূষণ বড়ুয়া চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অদ্বিতীয় সমাজনায়ক কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী বা কৃষ্ণ নাজিরের নাতনী ও সমিতির এক সময়ের সম্পাদক নগেন্দ্রলাল চৌধুরীর মেয়ে জ্যোৎস্নাময়ী চৌধুরীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রীর বড় বোন জ্যোতির্ময়ী বা জ্যোতির্মালা দেবী বৌদ্ধ সমাজে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম এম এ এবং সাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দুই শিশু পুত্রের জন্মদানের পর জ্যোৎস্নাময়ীর অকাল মৃত্যু হয়। ফণীবাবু পরে স্বগ্রাম মহামুনি পাহাড়তলীর জমিদার সারদা মুৎসুদ্দীর বড় মেয়ে তটিনী মুৎসুদ্দীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তটিনী দেবী জ্যোৎস্নাময়ীর গর্ভজাত দুই শিশু পুত্রকে আপন সন্তানের মতো অপরিসীম স্নেহমমতায় এমনভাবে লালন পালন করেছেন যে তাঁরা কেবল প্রাপ্তবয়স্ক হয়েই ঘটনাক্রমে

জানতে পারেন যে তাঁরা মা তটিনী দেবীর গর্ভজাত নয়। তটিনী দেবীর মতো স্নেহময়ী মহিয়সী জননী জগতে বিরল। এই মহিমান্বিত নারীর সেবাযত্ন ও পরিচর্যায় আইনজীবি ফণীভূষণ পরম নির্ভরতার মধ্যে সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন।

আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়ার দশজন ছেলে ও তিনজন কন্যা। জ্যেষ্ঠতাক্রমে পুত্রেরা হলেন ঃ প্রণব কুমার (প্রয়াত-সরকারের কাস্টমস বিভাগে প্রিভেন্টিভ অফিসার ছিলেন), প্রশান্ত কুমার (পেশায় ইনজিনিয়ার এবং ভারতে একটি প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত), প্রদ্যুত কুমার (১৪ বছর বয়সে অকালে প্রয়াত), প্রণোদিত কুমার (একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী এবং বর্তমানে প্রব্বজিত জীবনে সুমঙ্গল ভিক্ষু), প্রীতিশ কুমার (ব্যবসায়ী), পীযুস কুমার (ব্যবসায়ী-সম্প্রতি প্রয়াত), প্রমথেশ কুমার (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন), রূপম কিশোর (বিশিষ্ট শিল্পপতি, *Finance Director, Confidence Cement & Group of Companies; Director, Asian Paints Bangladesh Limited* এবং *District Governor, Lions International),* পার্থপ্রতিম (ব্যবসায়ী) এবং প্রসূনকুমার (ব্যবসায়ী)। তিন কন্যারা হলেন - অজিতা (স্বামী - সাগর বড়ুয়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক পর্যায়ে উচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন), নমিতা (স্বামী সুধীরচন্দ্র তালুকদার, বীমা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) এবং অনামিকা (স্বামী - চিন্ময় মুৎসুদ্দী, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং বর্তমানে জাতিসংঘের বাংলাদেশ অফিসে মিডিয়া কর্মকর্তা)। ফণীভূষণ বড়ুয়া বিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অগ্রযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়ে এখনো স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ফণীবাবু ও তটিনী দেবীর সস্নেহ পরিচর্যায় লালিত হয়ে সকল পুত্র কন্যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছেন। তেরজন পুত্রকন্যার মধ্যে প্রণব কুমার তাঁর স্বল্প জীবনকালে হৃদয়ের অপার মমতায় ছোট ভাইবোনদের পরম স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিলেন। ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসেবে যুক্ত থাকার পর রূপম কিশোর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পার্থপ্রতিম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'অমর বাংলার' সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে জনমত গঠন করেছেন। পরবর্তী জীবনে স্বাধীন বাংলাদেশে রূপম কিশোর বৌদ্ধদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে *Shipping* কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ১৯৮৫ সালে *Confidence Shipping Line* প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং পরে দেশের বেসরকারী খাতে সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য *Confidence Cement Limited* এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে *Finance Director* এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৯ সালে রূপমের একমাত্র পুত্র ইস্পাহানী কলেজের ১৮ বছর বয়সী ছাত্র অনিরুদ্ধ (অনি) মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হলে শোকে মুহ্যমান পিতা রূপম কিশোর 'অনিরুদ্ধ স্মৃতি স্ট্রাষ্ট' গঠন করে জনকল্যাণমূলক সেবাব্রতী কাজে নিয়োজিত হন।

স্বনামধন্য পিতা ফণীভূষণ বড়ুয়ার আদর্শে লালিত রূপম কিশোর *Lions Inernational* এর কার্যক্রমে নিবেদিতপ্রাণ সদস্য হিসেবে অবদান রাখার পর সম্প্রতি *Lions International* এর *District Governor* পদে নির্বাচিত হন।

ব্রিটিশ শাসনামলে আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির একজন শীর্ষ নেতা হিসেবে পশ্চাৎপদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সামাজিক সংস্কার সাধন, ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় সাহায্য, পালি শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকুরির সংস্থান ও ব্যবসায়ে সুযোগলাভ এবং সাংস্কৃতিক

ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কাজে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), নোয়াখালী, পটুয়াখালীতে অবস্থানরত বৌদ্ধেরা ভিন্ন সমাজের, বিশেষ করে উন্নতশীল হিন্দুদের সাথে অবস্থানে অনেক পিছিয়ে ছিল। কুসংস্কার, ভ্রষ্ট আচার ও ধর্মে তান্ত্রিকতার প্রভাবে সমাজ জীবন বিপর্যস্ত। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রয়াসে ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের (আচারীয়া পুণ্যাচার, গুণমেজু, কৃষ্ণনাজির, হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দী প্রমুখ) ক্লান্তিহীন চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চট্টগ্রামে তিনটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৌদ্ধদের পরিচালিত কয়েকটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে আধুনিক লেখাপড়া শুরু হয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয় কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবিরের প্রচেষ্টায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চেন্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে *Affiliation* সহ পালি শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ প্রবর্তিত হয়।

যৌবনে ফণীভূষণ সমাজের নেতৃস্থানীয় গুণীজন ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্য পেয়েছেন। জেঠা ডাক্তার কমলচন্দ্র বড়ুয়া ও পিতা মোক্তার সতীশচন্দ্র বড়ুয়ার সমাজকর্মের ঐতিহ্যকে ধারণ করে তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১৯১৩ সালের ১৩ অক্টোবর মহামুনি পাহাড়তলীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির বার্ষিক সভায় ফণীবাবুর পারিবারিক ধর্মগুরু মহানন্দ বিহারের অধ্যক্ষ এবং তৃতীয় সংঘরাজ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে সমকালীন বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি এবং থেরবাদী সংস্কারান্দোলন সম্পর্কে যে দীর্ঘ ভাষণ দেন, সেটা স্বভাবতই প্রায় ২৪ বছর বয়সী মেধাবী যুবক ফণীভূষণকে প্রভাবান্বিত করেছে। পণ্ডিত প্রবর আচার্য ধর্মাধার মহাস্থবির এই ভাষণকে বাংলার বৌদ্ধ সমাজের ঐতিহাসিক দলিল বলে অভিহিত করেছেন। মহামুনি পাহাড়তলী গ্রাম থেকে উদ্ভূত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রভাব যুবক ফণীভূষণকে উদ্দীপিত করেছিল। সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নবজাগরণের কেন্দ্র মহামুনি মন্দির, মহামুনি মেলা প্রভৃতি তাঁর মানসগঠনে অবদান রেখেছে।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ফণীবাবুর পারিবারিক মহানন্দ বিহারের ও মহামুনি পালি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আচার্য ধর্মাধারের নেতৃত্বে এ সময় মহানন্দ বিহারে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে একটি নিয়মিত আলোচনাচক্র গড়ে ওঠে। এই বিষয়ে আচার্য ধর্মাধার "পাহাড়তলী গ্রামের অতীত ঐতিহ্য" নিবন্ধে লিখেছেন "১৯৩৩ ইংরেজিতে প্রথমভাগে মহামুনি পালি কলেজের অধ্যক্ষরূপে আমি এই গ্রামে আগমন করি। তখন এই গ্রামের লোকেরা সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে উন্নত ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, অবসরপ্রাপ্ত ইনজিনিয়ার শ্রী যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া, সাব রেজিষ্টার শ্রী অধরলাল বড়ুয়া, অবসরপ্রাপ্ত দারোগা শ্রী শিরিশ চৌধুরী, ডাক্তার রমেশচন্দ্র চৌধুরী, রেইনজার শ্রী অতুলচন্দ্র বড়ুয়া, উকিল উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী, উকিল ফণীভূষণ বড়ুয়া, উকিল বিনয় ভুষণ বড়ুয়া, উকিল শচীন্দ্র মুৎসুদ্দী, উকিল শৈলেশ্বর চৌধুরী প্রমুখের সান্নিধ্য লাভের আমার সুযোগ হইয়াছে। তাঁহাদের প্রেরণা আমার জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা হইয়াছে।" (সাময়িকী প্রজ্ঞা, ১৯৮৯ বিনয়াচার্য জিনবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের ৮৮তম জন্ম জয়ন্তী স্মরণিকা থেকে)।

উল্লিখিত সুধী ব্যক্তিরা বৌদ্ধ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন। আইনজীবি ফণীভূষণের বয়স তখন চল্লিশ উর্ধ্বে। আচার্য ধর্মাধারের মতো অসামান্য পণ্ডিতের সাথে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রেরণা পেয়েছেন। এই সময়কালে মহামুনি পালি

কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ধর্মাধারের পরিচালনায় যাঁরা ধর্ম, বিনয়, অভিধর্ম ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম বিহারের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত শীলাচার শাস্ত্রী, আসামের প্রয়াত জিনরতন মহাথের, বর্তমানে দশম সংঘরাজ পণ্ডিত জ্যোতি:পাল মহাথের, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত শান্তপদ মহাথের, প্রাক্তন উপসংঘরাজ প্রয়াত সুগতবংশ মহাথেরোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১৯৮৯ প্রজ্ঞা সাময়িকীতে সুগতবংশ মহাস্থবিরের নিবন্ধ 'সংঘরাজ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির ও মহানন্দ সংঘরাজ বিহার।') এই বিহারের বিশিষ্ট দায়ক আইনজীবি ফণীভূষণ বৌদ্ধ সমাজের এই সব পন্ডিত ও উদীয়মান ধর্মগুরুদের সাথে নিয়মিত মত বিনিময় ও আলোচনার মধ্য দিয়ে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করেছেন।

ব্রিটিশ আমলে আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির একজন শীর্ষ নেতা হিসেবে সাংগঠনিক কার্যক্রমে থানায় থানায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৯ সালে সমিতির তদানীন্তন সভাপতি অগ্‌গমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবিরের মহাপ্রয়াণের পর সমিতি এক চরম সাংগঠনিক সংকটের মুখোমুখি হয়। "১৯৩৯ সালে বৌদ্ধ সমিতির সভাপতির আকস্মিক মৃত্যুতে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়। সমাজের কিছু লোক নির্বাচন ও মনোনয়ন ছাড়া নতুন সভাপতি নির্বাচন করে বসলেন।" (সূত্র : ড. সুকোমল চৌধুরী প্রণীত বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি)। প্রয়াত ধর্মবংশের মৃত্যুতে সাতবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত শোকসভাকে সাধারণ সভা ঘোষণা করে একজন নেতৃস্থানীয় ভিক্ষুকে নতুন সভাপতি ও এনায়েতবাজার বিহারের স্থায়ী বিহারাধ্যক্ষ ঘোষণা করার সিদ্ধান্তকে সংবিধান লংঘনকারী অভিহিত করে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়। সমিতির দুটো অংশ দীর্ঘকালীন এই অন্তর্ঘাতী মোকদ্দমায় ও মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এই সব ঘটনাবলীর মধ্যে আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া দৃঢ় প্রত্যয়ে অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সমিতির গণতান্ত্রিক ধারা ও ঐতিহ্যকে বহন করে বৌদ্ধদের আদি সংগঠন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির কর্মধারাকে তার মৌলিক আদর্শ অনুযায়ী সক্রিয় রাখার প্রয়াসী হলেন। ফণীভূষণ বড়ুয়া তাঁর দাদাশ্বশুর প্রতিষ্ঠিত এবং পিতৃদেবের প্রাণপ্রিয় সমিতির মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। ১৯৩৯ সাল থেকে ২৫ বছরব্যাপী খণ্ডিত সমিতির দুই অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে নিরসন হয় এবং সমিতি আবার ঐক্যবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে (সূত্র : বাংলাদেশী বৌদ্ধদের ইতিবৃত্ত: হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়া)। সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী ফণীবাবু জীবিতকালে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তাঁর আর্দশ সমুন্নত রেখে বৌদ্ধ সমাজের কল্যাণে কাজ করে গিয়েছেন।

ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানের পর ভারত বিভক্ত হলে ১৪/১৫ আগস্ট দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। ভারত বিভাগের জন্য ব্রিটিশ কেবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুযায়ী বাংলা বিভক্ত হয়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পালাবদলের এই ক্রান্তিলগ্নে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে দুই দেশ থেকে সংখ্যালঘুরা দেশান্তরী হতে থাকল। সেই অস্থির বিভ্রান্ত পরিবেশে পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দুদের ব্যাপক হারে ভারতের দিকে দেশত্যাগের হিড়িকে বৌদ্ধরাও চঞ্চল হয়ে পড়ে। তখন বৌদ্ধদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে ১৯৪৭ সালের ২২ জুন চট্টগ্রাম শহরে এনায়েতবাজারে বিহারে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী, ফণীভূষণ বড়ুয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা

ও ভবিষ্যত নিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারনের জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) ও পটুয়াখালী থেকে বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বহুসংখ্যক বৌদ্ধ নেতা এবং প্রায় সমুদয় উচ্চশিক্ষিত বৌদ্ধ সকলে একবাক্যে পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম, কৃষ্টি, রাজনৈতিক অধিকারের দাবী এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৌদ্ধ সমাজের যাবতীয় দাবী দরবার করবার জন্য ও পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্যে কনফারেন্স এক *Standing Committee* গঠন করে। (সূত্র : উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দীর পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তৃতা থেকে)।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার ক্রান্তিলগ্নে ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন ভারত বিভক্তির ফরমূলায় পাকিস্তান সৃষ্টি ইত্যাদি নানা জটিল বিষয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে আলাপ-আলোচনার ধারা ফণীভূষণ বড়ুয়া গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে অনুধাবন করেন। পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত চট্টগ্রামে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ও অন্য কয়েকটি জিলায় অবস্থানরত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন বোধ করেন এবং একজন প্রাজ্ঞ বাস্তববাদী নেতা হিসেবে মনে করেন যে পূর্ব পুরুষদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে দেশান্তরী হওয়া অনগ্রসর বৌদ্ধদের পক্ষে সম্ভব নয়। মুসলমান-প্রধান পাকিস্তানে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ও নতুন সরকারের সাথে সমঝোতা স্থাপন করেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব রক্ষা করার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। স্বধর্মের অনুসারীদের প্রতি গভীর ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি দেশ ছেড়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রখর রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধ সম্পন্ন দূরদর্শী বৌদ্ধ নেতা ফণীভূষণ বড়ুয়া দ্রুত পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের শীর্ষ নেতাদের সাথে আলোচনায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য নবসৃষ্ট পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন।

১৯৪৭-পরবর্তী স্বাধীন পাকিস্তানে বৌদ্ধদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ২২শে জুনের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ববঙ্গ আইনসভায় *Weightage* দিয়ে দুজন বৌদ্ধ সদস্য গ্রহণ এবং *Joint electorate with reservation of seats* অথবা মুসলমানেরা স্বতন্ত্র *Electorate* দাবী করলে বৌদ্ধদের জন্য স্বতন্ত্র ইলেকটরেট মঞ্জুর করার জন্য দাবী করতে হবে। আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা দিয়ে পরিবর্তনমুখী নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গঠিত পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতির প্রবক্তা হিসেবে বৌদ্ধদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি সরকার কর্তৃক পাকিস্তান গণপরিষদের মৌলিক নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটিতে সদস্য মনোনীত হন। স্বাধীনতাউত্তর কালে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনীতির ধারাকে অনুধাবন করে তিনি গভীর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হয়েও নতুন রাষ্ট্রের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নীতিনির্ধারণী প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেন : 'এখন থেকে পাকিস্তানে মুসলমান আর মুসলমান বলে পরিচিত হবে না, হিন্দু হিন্দু নামে পরিচিত হবে না, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও পার্সী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা স্ব স্ব ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হবে না - সকলে মিলে এক অভিন্ন পাকিস্তানী জাতি গঠন করবে।' অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু ও মুসলমান-দুটি জাতি এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হয়েও জিন্নাহ হয়তো এই সেকুলার রাষ্ট্রভাবনা দ্বারা নতুন দেশের সংহতি তৈরি করতে চেয়েছিলেনা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গণপরিষদের নতুন রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার অব্যবহিত আগেকার বক্তৃতাকে রাজনৈতিক ঐতিহাসিকেরা অসাধারণ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পাকিস্তানের পরবর্তী রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ফণীভূষণ বড়ুয়া স্বাধীন পাকিস্তানের নতুন নীতি ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবণ করে জিন্নাহর নীতিনির্ধারনী বক্তৃতার আলোকে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে বিজ্ঞজনোচিত ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি স্বাধীন পাকিস্তানের গণপরিষদের মৌলিক নাগরিক অধিকারসহ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাকিস্তানের যে সব শীর্ষ রাজনীতিবিদেরা এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ খান, মন্ত্রী সর্দার আবদুর রব নিস্তার, মন্ত্রী এম এ খুরো, মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মন্ত্রী ফজলুর রহমান, মন্ত্রী গজনফর আলী খান, সর্দার বাহাদুর খান, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, প্রেমহরি বর্মন, ভীমলেন সাচার, সিই গিবন (খ্রিস্টান নেতা), জামসেদ নুসেরওয়ানজী মেহতা (পার্সী নেতা) ও ফণীভুষণ বড়ুয়া (বৌদ্ধ নেতা) (সূত্র : *Government Report of the Committee on fundamental rights of citizens of Pakistan and on matters relating to minorities : Constituent Assembly of Pakistan -22nd December, 1952)*। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

এই নাগরিক অধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ কমিটিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও পার্সি সম্প্রদায়ের নেতারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতা ফণীভূষণ বড়ুয়া তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ক্ষুরধার মেধা দিয়ে গণপরিষদের চত্বরে বৌদ্ধদের অধিকার সংরক্ষণের যে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালান, সেটা ভারতীয় উপমহাদেশের বৌদ্ধদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কমিটিতে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অধিকার সম্বলিত সুপারিশমালা প্রনয়নের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। এই সব বিষয় নিয়ে চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে ফণীভুষণ বড়ুয়া বৌদ্ধদের মৌলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করে তাঁর রিপোর্ট গণপরিষদে ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে উপস্থাপিত করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সাথে তখনকার রাজধানী করাচীতে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থান ও দাবীসমূহ তাঁকে অবহিত করেন। তিনি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও শীর্ষ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। বক্তব্য প্রকাশে তাঁর অনায়াস স্বতস্ফুর্ত পারঙ্গমতা, ইংরেজিতে আলাপ-আলোচনায় স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী এবং তীক্ষ্ণ মেধায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে সহজ ব্যক্তিগত সমীকরণ নির্মাণে সক্ষম হন। গণপরিষদের নাগরিক অধিকার ও সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটিতে দেশে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তাতে একটি সুপারিশে দেশের সংবিধানে সংঘ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের *(Separate electorate)* বিধি সন্নিবেশিত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করে *Note of Dissent* দেন এই যুক্তিতে যে এতে সংখ্যালঘুরা অনিশ্চয়তা ও হীনমন্যতার শিকার হবে। তাঁরা সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণে যুক্ত নির্বাচনের দাবী জানায়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সিই গিবন এবং বৌদ্ধদের প্রতিনিধি ফণীভূষণ বড়ুয়া হিন্দুদের প্রদত্ত *Note of Dissent* এর সাথে একমত পোষণ করেননি এবং আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের পক্ষে মত প্রদান করেন। ফণীভুষণ বড়ুয়া আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি

দেখিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে দূরদৃষ্টি নিয়ে ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পৃথক নির্বাচনের ফরমূলায় সমতলীয় বৌদ্ধদের জন্য একটি সংরক্ষিত আসনে সুধাংশু বিমল বড়ুয়া প্রাদেশিক নির্বাচনের জয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে সদস্য হন।

তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ফণীভূষণ বড়ুয়া গণপরিষদে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তার ফলে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলীয় জিলাসমূহের গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা চালু, কারিগরী মহাবিদ্যালয় যেমন মেডিকেল কলেজ, ইনজিনিয়ারিং কলেজে পার্বত্য বৌদ্ধসহ মেধাবী বৌদ্ধ ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত বৌদ্ধ প্রার্থীদের জন্য বিশেষ বিবেচনা দেওয়া হয়। পঞ্চাশ দশকব্যাপী বৌদ্ধ ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা, কারিগরী কলেজসমূহে আসন সংরক্ষণ প্রভৃতি পদক্ষেপের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধদের শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সূচিত হতে থাকে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধদের স্বীকৃতি দান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সর্বপ্রথমবারের মতো পবিত্রতম দিবস বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৬ সালের দেশব্যাপী ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সময় ২২ মে এপ্রিল, ১৯৫৬ তারিখে মহামুনি পাহাড়তলীর বুদ্ধ জয়ন্তীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। "বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি" বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার পর তিনি লিখিত ভাষণের উপসংহারে বলেন : "আনন্দের কথা আমাদের পাকিস্তান এখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। .... ইসলামিক রিপাবলিকের কাঠামোর ইসলামিক নিয়মাবলীর অনুকূলে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র নিয়মিত হইতে চলিয়াছে। এ কথা মনে রাখিতে হইবে- ইসলামিক শাসনতন্ত্র মুসলমান শাসনতন্ত্র নয়। এই শাসনতন্ত কোরানিক। কোরান যাহা শিক্ষা দিয়েছে। তাহা এই : কি কি করা কর্তব্য, কি না করা কর্তব্য, শান্তির রাজ্য স্থাপন। আমরা নয়া শাসনতন্ত্রকে অভিনন্দিত করি। পাকিস্তান শান্তি ও সাম্যের ভিত্তিতে ও সমন্বয়ে স্বাধীন সার্বভৌম স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্ররূপে বিশ্বদরবারে বিশিষ্ট আসন লাভ করুক, ইহাই পাকিস্তানবাসী জনগণের কাম্য। আজ যাহারা হিংসায় উন্মুক্ত হইয়া একে অপরের ধ্বংস সাধনে পঞ্চমুখ, আমি তাঁদেরও স্মরণ করাইয়া দিই বুদ্ধের অমৃতময় বাণী অহিংসা পরম ধর্ম।" এটা সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত বক্তব্য। তিনি মুসলমান প্রধান ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে রাজনীতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বৌদ্ধদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসী ছিলেন। আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মেধাবী দূরদর্শী নেতা ফণীভূষণ বড়ুয়ার এই বক্তব্যে সমকালীন রাজনীতির স্রোতধারায় ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থান কূটনৈতিক কৌশলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণে এবং রাষ্ট্রের সমকালীন পরিস্থিতিতে বৌদ্ধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ফণীভূষণ বড়ুয়া তীক্ষ্ণতার সাথে রাষ্ট্রের উচ্চতর মহল থেকে শুরু করে নানা পর্যায়ে যে সব বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলোকে যথার্থ পটভূমিকায় অনুধাবন করতে হবে। তিনি ঢাকা, করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডি সফর করে মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শীর্ষ আমলাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বৌদ্ধদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন।

১৯৪৭-৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা ক্রমশ স্থিতিশীল হয়ে আসে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সরকারি চাকুরীতে *Option* এর সুযোগে ও কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পন্ন পরিবারের কিছু সদস্যরা দেশান্তরী হয়ে ভারতে

চলে যান। পাকিস্তানের নতুন পরিস্থিতিতে বৌদ্ধরা শত শত বছরের পিতৃপুরুষদের ভিটে মাটি আঁকড়ে ধরে প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছে। পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানে স্বধর্মের শিখা প্রজ্জ্বলিত ছিল। নিজেদের বাসভূমিতে নানা বিপদে বা সঙ্কটে বৌদ্ধরা দমিত হয়নি। বৌদ্ধদের ক্রমবিকাশে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজকে সংরক্ষণ ও উজ্জীবনে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে তীক্ষ্ণধী আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়ার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনায় তিনি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও মঙ্গলচিন্তায় নিয়োজিত ছিলেন। সুঠাম শরীরের অধিকারী সুবেশী আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া একাধারে সুবক্তা ও সংগঠক এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ও সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথনে স্বচ্ছন্দ যুক্তি প্রয়োগে দক্ষ। হৃদয়ের সাথে বুদ্ধিবৃত্তির এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য। প্রখর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী প্রখ্যাত আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়া ব্যক্তিজীবনে গুণগ্রাহী ও পরহিতব্রতী এবং মানুষের দুঃখে কাতর ও সমব্যথী ছিলেন। একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি সারাজীবন সাধারণ মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখে অবিমিশ্র অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

প্রখ্যাত বৌদ্ধ নেতা আইনজীবি ফণীভূষণ বড়ুয়ার নাম শতবর্ষের বৌদ্ধ ইতিহাসে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে। সমাজ-বিনির্মাণে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য।

তথ্যসূত্র

১. বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত বেণীমাধব বড়ুয়ায় জীবনী গ্রন্থ ঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া।

২. জগজ্জ্যোতি : *Dr. B.M. Barua Birth Centenary Commemoration Volume, Calculta, 1989, Editor : Hemendu Bikash Chowdhury*

৩. ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধবঃ ড. অঞ্জলি রায় - প্রকাশক ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কোলকাতা :(১৪০০ বঙ্গাব্দ)

৪. *A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy : Dr Benimadhav Barua, Published by Calcutta University (1921), reprinted by Motilal Banarsdass, Indological Publisher, Delhi. (1981).*

৫. নালন্দা, কোলকাতা, ১৯৯০ আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া স্মরণ সংখ্যা

৬. জগজ্জ্যোতি, কোলকাতা ১৩৫৯ বাংলা।

৭. *Ceylon Lectures reprinted by Sri Satguru Publication, Indological & Oriental Publishers, 40/5 Shakti Nagar, Delhi-110007.* (প্রথম সংস্করণ, কোলকাতা, ১৯৪৫; দ্বিতীয় সংস্করণ দিল্লী, ১৯৮৬)

৮. অগ্‌গসার জয়ন্তীর কার্যবিবরণী, ১৯৩৮ সাল; প্রকাশক - উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী, সম্পাদক, অগ্‌গসার জয়ন্তী কমিটি ও সভাপতি, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতি (মার্চ ১২ ও ১৩, ১৯৩৮)

৯. বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি বেণীমাধব বড়ুয়া। প্রকাশকাল ১৩২৮ বঙ্গাব্দ প্রকাশক - পুলিন বিহারী চৌধুরী, কোলকাতা।

১০. বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; কোলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

১১. সাহিত্য সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা, কোলকাতা, ১৯৮৯ সাল।

১২. জগজ্জ্যোতি *Kripasaran Mahathero 125th Anniversary Volume, 1990।*

লেখক পরিচিতি : দেবপ্রিয় বড়ুয়া ডি.পি. বড়ুয়া নামে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকদের অন্যতম এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বা.স.স) প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে প্রায় ছয় বছর (১৯৯১-১৯৯৬) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৫৮ সালে ইংরেজী সাহিত্যে

এম.এ. পাশ করার পর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ঢাকার ইংরেজী দৈনিক *The Morning News* পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে যোগ দেন। প্রায় ৪০ বছর ব্যাপী পেশাগত জীবনে তিনি বহুমুখীনতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং ভারত, পাকিস্তান, মিশর, কুয়েত, বাহারাইন, গণচীন, জাপান, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ সাংবাদিক হিসেবে সফর করে নানা ধরণের প্রতিবেদন লিখেছেন। ১৯৭৪ সালের ১৪ই মে তিনি নতুন দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ৭০ মিনিটব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রসংগে একান্ত একক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বিশেষ প্রতিবেদন লিখেছেন। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলশ্রুতিতে মঙ্গোলীয়ায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্রান্তিকালীন সময়ের তদানীন্তন ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর অফিসে একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরী করেন। ১৯৯৪ সালে বা.স.স. এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে বেইজিং-এ এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় সংবাদ সংস্থাসমূহের প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকালীন সময়ে গণচীনের প্রেসিডেন্ট ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জিয়াং জেমিনের সাথে *Great Hall of the People* এ এক ঘন্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অঙ্গনে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও স্বদেশের ভাবমূর্তি নির্মাণে অবদান রেখেছেন। ১৯৬৩ সালে বৌদ্ধ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে চীন সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-য়ের সাথে *Great Hall of the People* এ সাক্ষাৎকারের সময় কালজয়ী বৌদ্ধ পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ভস্মধাতুর অংশ ঢাকার ধর্মরাজিক বিহারে উপহার দানের জন্য অন্যতম প্রস্তাবক। তিনি এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৩০টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে ১৯৬৩ সাল থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা (এবিসিপি) বিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে এই সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল। ১৯৮২ সালে তিনি মঙ্গোলীয়ার রাজধানী উলান বাতায় অনুষ্ঠিত এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলন কর্তৃক সনদপত্রসহ 'আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তি স্বর্ণপদকে' ভূষিত হন। মানসিক প্রতিবন্ধীদের অধিকারের প্রবক্তা হিসেবে তিনি ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও শিক্ষা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি। এই সমিতিতে প্রায় দশ বছর ধরে প্রথম সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালনের পর তিনি তিনবার ১৯৮৮-৯০, ১৯৯৩-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৭ কার্যকালে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সমিতিতে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিভিন্ন বছরে স্পেন, নরওয়ে, ইংল্যান্ড, কেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রতিবন্ধী সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। সমাজকল্যাণে অবদানের স্বীকৃতিতে তাঁকে "অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদকে" ভূষিত করা হয়।

এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা এই পাঁচটি মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সাংবাদিক, বৌদ্ধ নেতা ও প্রতিবন্ধীদের প্রবক্তা হিসেবে বিগত ৩৭ বছর যাবত ৫০টি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর লেখা নিবন্ধ ও কলাম দেশ ও বিদেশের ইংরেজী ও বাংলা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো হল *"His Holiness Sangharaj Shilalankar : A Short Biography,* বেণী মাধব বড়ুয়া (বাংলা একাডেমী প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ) ও বাঙালীর দর্শন চিন্তায় বৌদ্ধ অবদান শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ (এশিয়াটিক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঙালীর দর্শন চিন্তা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)।

PROFESSOR B. M. BARUA'S BOOKS AND ARTICLES

A. BOOKS IN ENGLISH

1. **A Prolegomena to a History of Buddhist Philosophy**
   Published by the University of Calcutta, 1918.

2. **The Ajivikas**
   Published by the University of Calcutta, 1920.

3. **A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy**
   Published by the University of Calcutta, 1921 (reprinted by Motilal Banarsidass, Delhi, 1970, 1981).

4. **Prakrit Dhammapada** (a critical edition with translation & notes) jointly with Sailendranath Mitra, published by the Unversity of Calcutta, 1921.

5. **Barhut Inscriptions** (a critical edition with translation & notes) jointly with Kumar Gangananda Sinha, published by the University of Calcutta, 1926.

6. **Old Brahmi Inscription in the Udayagiri and Khandagiri Caves**
   published by the University of Calcutta, 1926.

7. **Asoka Edicts in New Light**
   published by the Indian Research Institute, Calcutta 1934

8. **Gaya and Buddhagaya**, Volume I
   published by the Chuckervertty Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta, 1931.

9. **Gaya and Buddhagaya**, Volume II
   published by the Indian Research Institute, Calcutta 1934.

10. **Barhut**, Volumes I. II & III
    an authoritative work on the Stupa of Barhut in three volumes, published by the Indian research Institute, Calcutta, 1934-37.

11. **Brahmachari Kuladananda**
    a biography of the Bengali saint and of his Guru Sree Sree Vijoykrishna Goswami, containing incidental references to many other contemporary saints.
    published by the Thakurbari Committee, Puri, 1938.

12. **Inscriptions of Asoka**, Part I (a critical edition of the texts)
    published by the University of Calcutta, 1943.

13. **Inscriptions of Asoka**, Part II (translation and notes)
    published by the University of Calcutta, 1945.

14. **Ceylon Lectures**
    published by the Bharati Mahavidyalaya, Calcutta, 1945

15. **The Religion of Asoka**
published by the Maha Bodhi Society of India, Calcutta.

16. **Asoka and His Inscriptions**
published by the New Age Publishers, Calcutta, 1946.

17. **Philosophy of Progress**
published by the Novelty Publishers, Calcutta, 1984.

18. **Studies in Buddhism**
a collection of twelve articles on Buddhism written by Professor B.M. Barua and edited by Binayendranath Chowdhury; published by Saraswat Library, Calcutta, 1974.

19. Three more books (i) **Chakma Taras from Chittagong Hill Tracts** (ii) **Manuscripts of Dharma Samuccaya and Karandavyuha** (iii) **Burmese Manuscripts of later Pali Works** are mentioned in the Hundred Years of the University of Calcutta, 1957.

B. ARTICLES IN ENGLISH

I. Contributions to Conferences

1. **Bhakti Sutras of Sandilya**
in the proceedings of the 2nd All India Oriental Conference, 1922.

2. **Presidential Address - Prakrit Section**
in the proceedings of the All India Oriental Conference, Tirupati, Andhara Pradesh, 1940.

3. **Trends in Ancient Indian History**
Presidential Address - Ancient Indian Section; All India History Congress, Annamalainagar, Tamilnadu, 1945.

4. **The Role of Buddhism in Indian Life and Thought**
Lecture delivered in the symposium of the Indian Philosophical Congress, Delhi, 1946.
(subsequently reproduced in The Maha Bodhi and Indian Culture).

5. **The Atthaakavagga Parayanavagga as two companions of Pali Anthologies**
in the proceedings of the 5th All India Oriental Conference.

II. CONTRIBUTIONS OF COMMEMORATION VOLUMES

6. **Faith in Buddhism**
B. C. Law, Buddhistic Studier, Volume I. Calcutta, 1931.

7. **Early Buddhism**
The Cultural Heritage of India. Volume I, Publised on the occasion of the Birth Centenary of Sri Ramkrishna, Calcutta, 1937 (subsequently reprinted by the Ramkrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1958).

8. **The Arthasastra of Kautilya, a blend of Old and New**
Bharata Kaumudi, Studies in Indology in honour of Professor Radhakumud Mookerji, Allahabad, 1945.

9. **On the Edicts of Asoka : Some points of interpretation**
D.R. Bhandarkar Volume, edited by B.C. Law, Caicutta, 1940.

10. **Pratityasamutpada as the Basic Concept of Buddhist Thought**
B.C. Law Volume, part I, edited by D.R. Bhandarkar, Poona, 1945.

11. **Indus Script and Tantric Code**
B.C. Law Volume, part II.

12. **Mahayana in the Making**
Orientalia, Sir Asutosh Silver Jubilee Commemoration Volume III, Calcutta.

13. **Asoka's Examples: their historical importance**
K.M. Munshi Volume, Bombay.

III. CONTRIBUTIONS TO JOURNALS AND BOOKS

14. **A note of the Bhabru Edict** (Journal of the Royal Asiatic Society, 1915).

15. **Bhabru Edict of Asoka** (JRAS, 1921).

16. **Buddhist Divinities as Embodiment of the Thirty-Seven constitutents of Supreme Knowledge**
(Journal of the Indian Society of Oriental Art, Volume VIII, 1940)

17. **The Celestial luminaries in Asoka's Rock Edict**, IV (JISOA, Vol. VIII, 1940)

18. **On the Antiquity of Image-Worship in India** (JISOA, Vol. XI, 1943).

19. **The Saugar Copper-plate Inscription of Trailokyavarman**
(Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 1947).

20. **Valmiki as he reveals himself in his poem** (Journal of the Department of Letters, Vol. III, University of Calcutta, 1920; subsequently translated into Hindi by Kumar Gangananda Sinha.

21. **Buddhadatta and Buddhaghosa - Their contemporaneity and age**
(University of Ceylon Review, Vol. III, 1945).

22. **The Year of Commencement of the Buddha Era** (University of Ceylon Review).

23. **The Barhut Sculptures in the Museum of Allahabad Municipality**
(Journal of the Uttarpradesh Historical Society).

24. **Ajivika and Ajivikism** (Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute).
25. **Message from Barhut Jataka Lebels** (Indian Historical Quarterly, Vol. 1. pp. 50-56, 245-9).
26. **Inscription Excursion** (a critical review of the studies in the Inscription of Asoka; IHQ, Vol. II, 1926, pp. 87 - 126).
27. **Multiplications of Jatakas** (IHQ, Vol. II).
28. **Stupa and Tomb** (IHQ, Vol. II).
29. **Old Brahmi Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri Caves - Language and Style** (IHQ, Vol. IV, pp. 511-29).
30. **Gosala as an Epithet of Makkhali** (IHQ, Vol. IV).
31. **Old Buddhist Shrines at Buddhagaya** (IHQ, Vol. VI).
32. **The Yerragudi copy of Asoka's Minor Rock Edict** (IHQ, Vol. IX; subsequently revised in Vol. XIII).
33. **Bodha Gaya Image Inscriptions** (IHQ, Vol. IX, pp. 417-419).
34. **The Old Brahmi Inscriptions of Mahasthan** (IHQ, Vol. X, pp. 57-66).
35. **The Soghaura Copper-plate Inscription** (IHQ Vol. X, pp. 54-56)
36. **Minor Old Brahmi Inscriptions in Udayagiri and Khandagiri Caves**
    (Revised Edition, IHQ, Vol. XIV, pp. 158-166)
37. **The Hathigumpha Inscriptions of Kharavela** (Revised Edition, IHQ, Vol. XIV, pp. 459-485)
38. **Common Ancestry of the Pre-Ahom Rulers and some other problems of the Early History of Assam** (IHQ, Vol. XXIII).
39. **Scribe Engravers of Indrapala's Second Copper-plate and Prakrit of Pre-Ahom times** (IHQ, Vol. XXIII, pp. 242-247).
40. **Maskari-what it signifies** (IHQ).
41. **Visnudasa - A Vaisnava Reformer of South India** (Indian Culture, Vol. I, Nos. 1-4).
42. **Art as defined in the Brahmanas** (IC, Vol. I).
43. **Identity of Asandhimitta and Kaluvaki.** (IC, Vol. I).
44. **Cittavisuddhiprakarana - Its Pali basis** (IC, Vol. I).
45. **Five Reliefs from Nagarjunikonda** (IC, Vol. I).
46. **Estimate of the people of Orissa** (IC. Vol. I).
47. **National Shrines of the Vrijis** (IC, Vol. I).
48. **Two Buddhaghosas** (IC, Vol. I).

49. **Bogus Bodh Gaya Plaque** (IC, Vol. I).

50. **Review of Buddhism - Its Birth and Dispersal by** Mrs. Rhys Davids (IC, Vol. I).

51. **On a Point of Interpretation** (IC, Vol. II, July 1934 - April 1936).

52. **Upanisa and Upanisad** (IC, Vol. II).

53. **Bhela-Samhita - discussing its historical importance** (IC, Vol. III, July 1936 - April 1937).

54. **Bodh Gaya Sculptures** (IC, Vol. III).

55. **The Abhayagiri Schools in comparison and the number of Jatakas in the Abhidhamma Pitaka** (IC, Vol. V, July 1938 - June 1939).

56. **Review of 'Vimuttimagga and Visuddhimagga' by P.V. Bapat** (IC. Vol. V).

57. **Pre-Buddhist India** (IC, Vol. VIII, July 1941 - June 1942).

58. **Atthasalini** (IC, Vol. IX, July 1942-June 1943).

59. **Social Status of the Mauryas** (IC, Vol. X, July - September 1943).

60. **Isitala Tadaga in Kharavela's Inscriptions** (IC, Vol. XI, July - September 1945).

61. **Buddha's Dotrine of the Mean** (IC, Vol. XII, July 1946 - June 1947).

62. **Forms, Merits and Defects of Asoka's Inscriptions** (IC).

63. **Rastriya Vaisya Pusyagupta and Yavanaraja Tusaspha in Rudradaman's Inscriptions** (IC).

64. **Dharma Samuccaya** (IC().

65. **Historical Background of Jainology and Buddhalogy** (Calcutta Review 1924).

66. **Burma nnd Burma Life** (CR, 1924).

67. **Buddha of History** (CR, 1925).

68. **Nature of Barhut Sculptures** (CR, 1926).

69. **Burma and Burma Treasures** (CR, 1927)

70. **Thoughts on Progress** (containing the dialectics of history and the formulation of the author's own philosophy (CR, published serially in 1930).

71. **Early Life of Gosala** (CR).

72. **Early Life of Gosala** (CR).

73. **Asia; Past and Present** (Modern Review).

74. **Asoka's Examples and Brahmin Animosity** (MR).

75. **The Meher Copper-plate Inscription of Damodaradeva** (Epigraphica India).

76. **India Through the Greek Eye - Cultural Aspects** (The Nationalist, Puja Number, 1946).

77. **Asia, Prior to Western Supremacy** (Indo Iranica, a quarterly journal of The Iran Society, Calcutta).

78. **Universal aspect of Buddhism** (Bauddha Prabha, journal of the Buddha Society Bombay).

79. **Buddhism and its psychological foundation** (Twentieth Century India, published from U.S.A.).

80. **Religions** (Other than Hindu), [History of Bengal, published by the University of Dhaka]

81. **Genesis of the Books of Stories of Heaven and Hell** (in appendix to 'Heaven and Hell in Buddhist Perspective' by B. C. Law, Calcutta, 1925).

82. **Foreword to Historical Gleanings by B.C. Law.**

83. **An Assamese introduction to the Kavitakunja** (compiled by Birinchikumar Barua)

84. **Kavi-paricaya in Assamese, a psychological analysis of mind and art of Poet Dimbeswar Beogi**.

85. **Foreward to History of Indian Prostitution.**

86. **Dr. B. C. Law - A Memoire**, published in Dr. B. C. Law; His Life and Work by R.K. Mookerji, Calcutta, 1951.

C. BOOKS IN BENGALI

১. **লোকনীতি**
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯১২।

২. **মণিরত্নমালা**
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯১৩।

৩. **গৃহী বিনয়**
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯১৩।

৪. **মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত**
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯১৪।

৫. **বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি**
কলকাতা, ১৯২৩।

৬. **বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ**, প্রথম ভাগ
ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৩৬।

৭. **মধ্যমনিকায়**
যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটচক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪০।

D. ARTICLES IN BENGALI

১. **বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান** (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলকাতা, ১৩৫২ বাংলা)।

২. **ভেলসংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব** (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫ বাংলা)।

৩. **শিবচরণের গীতিপদ** (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭ বাংলা)।

৪. **গোজেন লামা** (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা)।

৫. **গুপ্তযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি** (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৬, জগজ্জ্যোতি, নব পর্যায়, ৫ম বর্ষ, ১৯৫৫ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

৬. **প্রার্থনা ও উপাসনা** (জগজ্জ্যোতি, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৯০৮)।

৭. **বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ** (জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, নবম সংখ্যা ১৩১৯ বাংলা)।

৮. **বৌদ্ধধর্ম ও পুনর্জ্জন্ম** (অধ্যাপিকা আলেকজান্দ্রা ডেভিড নীলের প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ, জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ১৩১৯ বাংলা)।

৯. **মহাস্থবির কালীকুমার** (জগজ্জ্যোতি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৯১৪)।

১০. **ডাক্তার কমল চন্দ্র বড়ুয়া** (জগজ্জ্যোতি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৯১৪)।

১১. **বৌদ্ধ দর্শনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব** (জগজ্জ্যোতি, ৭ম বর্ষ, ১৯১৫)

১২. **শাক্য লিচ্ছবি ও বৃজিবংশের ধ্বংস কাহিনী** (জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ১৩১৯)।

১৩. **প্রতীচ্যে বৌদ্ধ ধর্ম** (জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ১৩১৯)।

১৪. **আদি বৌদ্ধ ধর্ম** (নালান্দা, কলকাতা, বুদ্ধপূর্ণিমা সংখ্যা ১৯৭৫; ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার জীবন ও দর্শন, চট্টগ্রাম, ১৯৮৩)।

১৫. **ভূমিকা** - পালি প্রবেশ, জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির সংকলিত, ১৯৩৭)।

১৬. **মুখবন্ধ** - অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি অনুদিত ও সম্পাদিত, ১৯৪০।

১৭. **মুখবন্ধ** - চার পুণ্যস্থান, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা, ১৩৪২)।

১৮. **প্রস্তাবনা** - ধর্মবিজয়ী অশোক, প্রবোধচন্দ্র সেন।

১৯. **অভিভাষণ** - ১৯৩৮ সালের ১২ মার্চ ভগীরথনগরে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মহাসভার সমাজ শাখার অধিবেশনে প্রদত্ত (জগজ্জ্যোতি ১৯৮১-৮২)

২০. **ভূমিকা** - রাজর্ষি বিশন্তর, বিমলানন্দ মহাস্থবির, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ ১৯৮০।

২১. **তিনজন পথ প্রদর্শকের অবদান** - ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রামের আবুরখিল গ্রামে অনুষ্ঠিত কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া, পন্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া এবং আভিধার্মিক রামচন্দ্র বড়ুয়ার স্মরণোৎসবে সভাপতির ভাষণ (জগজ্জ্যোতি, বুদ্ধজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৭৩)।

২২. **প্রতিবাদ ও সমালোচনা**
(১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ (নারায়ন)।

(২) রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের একটি গল্পের বই (শনিবারের চিঠি)।

Selected Bibliography on Life and Works of Professor B. M. Barua

1. **Indian Culture**, B.M. Barua Commemoration Volume, Vol. XV, Nos. 1 - 4 (July 1948 - June 1949) ed. B. C. Law, Pub. Indian Research Institute; pp. i-iv, articles by H.C. Ray Chaudhury & A. P. Buddhadatta.
2. **Development of Post-Graduate Studies in Arts and Letters in the University of Calcutta** (1907 - 1948) pub. University of Calcutta, 1949.
3. **Hundred Years of the University of Calcutta**, pub. University of Calcutta, 1957.
4. **Bibliography on Buddhism**, S. Hanayama, Tokyo, 1961.
5. **Journal of the Department of Pali**, pub. Univ. of Calcutta, 1982-83.
6. **Contemporary Buddhism in Bangladesh**, Sukomal Chaudhuri, Calcutta, 1982.
7. **A Short History of the Pali Studies in the University of Calcutta** (1990-1986), Sukumar Sengupta, Calcutta, 1986.
8. **WFB Review**, Vol. XXV, No. 1, 1988 ed. Siri Buddhasukh, pub. World Fellowship of Buddhists, Bangkok; pp. 23-27 & 19, article by Hemendu B. Chowdhury.
9. **Jyoti**, Buddha Purnima Souvenir 1988, ed. B. K Barua, pub. Pali Book Society, Chittagong; article by H.B. Chowdhury.
10. **The 16th General Conference of the World Fellowship of Buddhists & The Grand Opening of Fo Kuang Shan Hsi Lai Temple Souvenir Magazine**, 1988, pub. International Buddhist Progress Society, USA; pp. 151-155, article by H.B. Chowdhury.
11. **In Remembrance of Dr. B.M. Barua: An Englightened Self and A name dignified, rspected & honoured**, 31, December 1988, pub. Bauddha Dharmankur Sabha, Calcutta, on his 100th Birthday Celebration.
12. **Professor Benimadhab Barua, A Birth Centenary Tribute**, pub. Professor B.M. Barua Birth Centenary Celebration Committee, Calcutta, 1988.
13. **Buddhist for peace**, Vol. 10, No. 1, 1988; ed. B. Wangchindorj, pub. Asian Buddhist Conference for peace, pp. 45-48; article by Hemendu B. Chowdhury.

১৪. **জগজ্জ্যোতি**, ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া স্মরণে, নবপর্যায় ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৫৯ বাংলা, সম্পাদক শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রকাশক ধর্মপাল ভিক্ষু (মহাথের) বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, কলকাতা; পৃঃ ১-৩৮, প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রবোধ চন্দ্র সেন, শৈলেন্দ্রনাথ

মিত্র, নলিনাক্ষ দত্ত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, রামপ্রসাদ চৌধুরী, প্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়া, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৫. **সমকালীন**, নবম সংখ্যা, ১৯৬৫, পৃ: ৪৫৮-৪৬২)

১৬. **ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার জীবন দর্শন**, সীতাংশুবিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮৩।

১৭. **যুগান্তর**, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যা, পৃঃ ৬, হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর প্রবন্ধ

১৮. **জগজ্জ্যোতি**, ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া স্মারক সংখ্যা, ১৯৮১-৮২। প্রকাশক - ধর্মপাল মহাথের, সাধারণ সম্পাদক - বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলকাতা, সম্পাদক - হেমেন্দু বিকাশ বড়ুয়া।

১৯. **কৃষ্টি**, আষাঢ়ী পূর্ণিমা সংখ্যা ১৯৮৮; সম্পাদক শুদ্ধানন্দ মহাথের, প্রঃ বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, ঢাকা, হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর প্রবন্ধ।

২০. **বোধিভারতী**, ঊনবিংশ বার্ষিক সংকলন, ১৯৮৮, সম্পাদক সমর বড়ুয়া, প্রঃ বোধিভারতী, কলকাতা, পৃঃ ৩৪-৪৩, সুকোমল চৌধুরীর প্রবন্ধ।

২১. **কলকাতা**, প্রথমবর্ষ, সংখ্যা ১৫১, সম্পাদক সুহাস তালুকদার, কলকাতা, পৃঃ ৩, হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর প্রবন্ধ।

২২. **ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব**, অঞ্জলি রায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত থিসিস, ১৯৮৬।

২৩. **চট্টগ্রাম পরিষদ স্মরণিকা**, ১৯৮৯, বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রবন্ধ।

২৪. **শতাব্দীর আলোয় বেণীমাধব** - ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-তে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরীর ভাষণ।

২৫. **অনোমা** (ড. বেণীমাধব বড়ুয়া জন্মশতবার্ষিকী স্মারক), ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৮, সম্পাদক - অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, প্রকাশক - অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম।

২৬. **সদ্ভাবা** (ড. বেণীমাধব বড়ুয়া জন্মশতবার্ষিকী স্মারক), ১৯৮৯, প্রকাশক - মহামুনি তরুণ সংঘ, মহামুনি পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

By Courtesy : Jagajjyoti, Dr. B. M. Barua Birth Centenary Commemoration Volume, 1989, Ed. Hemendu Bikash Chowdhury, Pub : Ven. Dharmapal Mahathera, Bauddha Dharmankur Sabha, Calcutta.

অতীত নয় শুধু বিস্মৃতির নামান্তর
গতকাল ছুঁয়ে থাকে আজকেরও প্রান্তর

সবিনয় নিবেদন

অতীতের ভিতে দাঁড়িয়েই বর্তমানের নির্মিতি।
উত্তরসূরিরা মননে ধারণ করে চলি পূর্বসূরিদের
গৌরবদীপ্র চেতনার নির্যাসটুকু। সেই চেতনার
আলোকেই আমরা আয়োজন করেছি

'বেণীমাধব ও ফণীভূষণ স্মারক বক্তৃতামালা'র
প্রথম বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

'বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতি চেতনার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বমনীষা
অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এবং বৌদ্ধ সমাজের
অগ্রগতিতে প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট ফণীভূষণ
বড়ুয়ার অবদান' শীর্ষক বক্তৃতা দেবেন বাংলাদেশ সংবাদ
সংস্থা (বাসস)'র প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান
সম্পাদক ,কলামিস্ট ডি পি বড়ুয়া।

এ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে আপনার দীপ্ত উপস্থিতি
আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।
চলুন, বিস্মৃতিপ্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে
আলোকিত ভবিষ্যৎ নির্মাণে
আমরা উজ্জীবিত হই।

অ্যাডভোকেট প্রেমাঙ্কুর বড়ুয়া
সভাপতি
অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া
মহাসচিব

অ নো মা সা ং স্কৃ তি ক গো ষ্ঠী
(বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের আঞ্চলিক কেন্দ্র)
চট্টগ্রাম।

অনুষ্ঠান সূচি

চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তন
০৬ ডিসেম্বর ২০০১; ২২ অগ্রহায়ণ ১৪০৮
বৃহস্পতিবার ,বিকেল ৪.৩০টা

প্রবন্ধ উপস্থাপক	:	ডি পি বড়ুয়া কলামিস্ট,প্রাবন্ধিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক (অব.) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
সম্মানিত প্রধান অতিথি	:	শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের মহামান্য সংঘরাজ, বিশ্বনাগরিক, পন্ডিত বহু গ্রন্থপ্রণেতা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক
সম্মানিত আলোচকবৃন্দ	:	অধ্যাপক ড. সুনীতিভূষণ কানুনগো ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
	:	সৈয়দ আবুল মকসুদ বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত গবেষক, লেখক, সাংবাদিক
	:	হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক-জগজ্জ্যোতি (ভারত)
	:	অরুণ দাশগুপ্ত কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সম্পাদক-দৈনিক আজাদী
	:	অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া সম্পাদক-অনোমা
	:	অধ্যাপক শিশির বড়ুয়া সম্পাদক-বুদ্ধিস্ট একাডেমী জার্নাল
উদ্বোধনী ভাষণ	:	লায়ন গভর্ণর রূপম কিশোর বড়ুয়া এম.জে.এফ. লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল, ডিষ্ট্রিকট ৩১৫-বি-৪
স্বাগত ভাষণ	:	অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া
সভাপতি	:	অ্যাডভোকেট প্রেমাঙ্কুর বড়ুয়া
অনুষ্ঠান উপস্থাপনা	:	আশীষ বড়ুয়া ও সুচরিতা বড়ুয়া